তঞ্চঙ্গ্যা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন

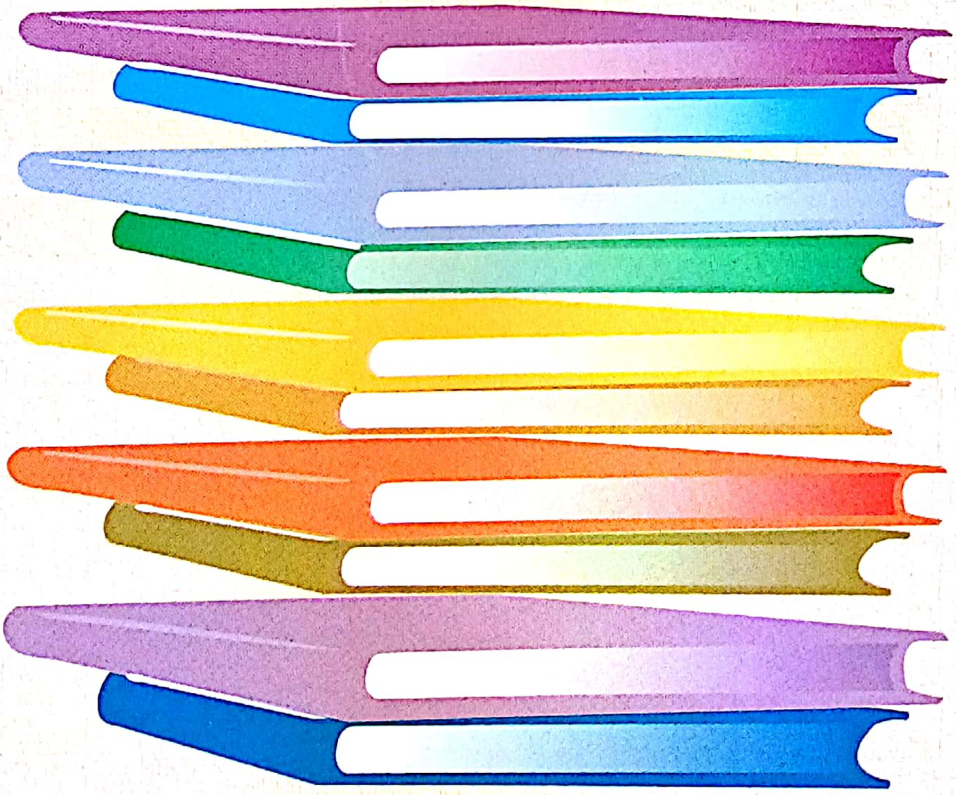

প্রমোশন এন্ড প্রটেকশন অব ইন্ডিজিনাস রাইটস (পিপিআইআর)
প্রকল্পের গবেষণাধর্মী গ্রন্থণা

কপো সেবা সংঘ
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
ঢাকা

Scanned with OKEN Scanner

তথ্যগুচ্ছ

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন

গবেষণাধর্মী গ্রন্থণা

গ্রন্থণা ও সম্পাদনা

এডভোকেট জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা

এডভোকেট প্রতিম রায়

সাংবাদিক শৈলেন দে

প্রকাশক ঃ **কপো সেবা সংঘ**

আদালত সড়ক, বনরূপা, রাঙ্গামাটি

সহযোগী সংস্থা ঃ মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

ঢাকা

Scanned with OKEN Scanner

প্রকাশক
কপো সেবা সংঘ
আদালত সড়ক, বনরূপা, রাঙ্গামাটি

প্রকাশকাল
আশ্বিন ১৪১৪ বঙ্গাব্দ; সেপ্টেম্বর ২০০৭ খৃস্টাব্দ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
শৈলেন দে, গবেষণা সহকারী, পিপিআইআর প্রকল্প

শেষ প্রচ্ছদ
পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অবস্থান চিহ্নিত করে চিত্রশিল্পী নাথান লনচেও এর আঁকা মানচিত্র। সৌজন্যেঃ জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল (জাক), রাঙ্গামাটি
সংগ্রাহকঃ পার্থ প্রতিম তালুকদার (মিঠুল), পিপিআইআর প্রকল্প

শব্দ বিন্যাস
পার্থ প্রতিম তালুকদার (মিঠুল), পিপিআইআর প্রকল্প

আলোকচিত্র ঃ মং মং প্রু (গবেষণা সহকারী) পিপিআইআর প্রকল্প

গ্রন্থ স্বত্ব
কপো সেবা সংঘ, রাঙ্গামাটি ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ঢাকা

অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
অনিন্দ্য
গাউসিয়া মার্কেট, নিউ কোর্ট বিল্ডিং রোড, রাঙ্গামাটি

মুদ্রণ
নিও কনসেপ্ট (প্রাঃ) লিঃ
৭ সিডিএ বা/এ, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম

Scanned with OKEN Scanner

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতির ভিত্তিতে বিশেষ অধিকারসমূহ সংরক্ষণ এবং সচেতনতা উদ্বুদ্ধকরণ (পিপিআইআর) প্রকল্প
মার্চ ২০০৫ - মে ২০০৭

গবেষণা ইউনিট

- নির্বাহী পরিচালক ঃ মিসেস সেরীন চাকমা
- প্রধান গবেষক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী ঃ এডভোকেট প্রতিম রায়
- গবেষক, পরামর্শক ঃ এডভোকেট জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা
- গবেষণা সহকারী, প্রোগ্রাম অর্গানাইজার ঃ সাংবাদিক শৈলেন দে
- গবেষণা সহকারী, ফিল্ড অর্গানাইজার ঃ এডভোকেট সুস্মিতা চাকমা
- গবেষণা সহকারী, ফিল্ড অর্গানাইজার ঃ মহেন্দ্র লাল ত্রিপুরা
- গবেষণা সহকারী, ফিল্ড অর্গানাইজার ঃ মং মং প্রু
- ফিল্ড অর্গানাইজার ঃ মঙ্গল বিজয় চাকমা
- ফিল্ড অর্গানাইজার ঃ শিমুল চাকমা

প্রকল্প পরামর্শক

- ড. মিজানুর রহমান ঃ মূখ্য পরামর্শক
  অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জনগোষ্ঠীভিত্তিক পরামর্শক

- বাবু ঁনবীন কুমার ত্রিপুরা ও বাবু খগেশ্বর ত্রিপুরা ঃ ত্রিপুরা পরামর্শক
- বাবু ক্য শোয়ে প্রু ও মিঃ চ হ্লা প্রু (জিমি) ঃ মারমা পরামর্শক
- এডভোকেট দীননাথ তঞ্চঙ্গ্যা ঃ তঞ্চঙ্গ্যা পরামর্শক
- মিঃ জুয়ামলিয়ান আমলাই ঃ বম পরামর্শক
- মিঃ সিং ইয়ং ও মিঃ রাংলাই ম্রো ঃ ম্রো পরামর্শক
- মিঃ সি অং খুমি ঃ খুমি পরামর্শক
- মিসেস তাতু লুসাই ও মিঃ লাললিয়ান থাং ঃ লুসাই পরামর্শক
- মিঃ কিপলাল পাংখোয়া ও মিঃ চিয়ালজল পাংখোয়া ঃ পাংখোয়া পরামর্শক
- মিঃ মং মং খিয়াং ও মিঃ ঁঅরুন লেইব্রেস ঃ খিয়াং পরামর্শক
- মিঃ মংসাথোয়াই চাক ঃ চাক পরামর্শক

সহযোগিতায় ঃ

- ড. শামীম ইমাম, পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
- জনাব ওয়াসিউর রহমান (তন্ময়), প্রোগ্রাম ম্যানেজার, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

Scanned with OKEN Scanner

পিপিআইআর প্রকল্প কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত প্রকাশনা

১. চাকমা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন

২. মারমা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন

৩. ত্রিপুরা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন

৪. তঞ্চঙ্গ্যা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন

৫. ম্রো ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন

৬. বম ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন

৭. খুমি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন

৮. খিয়াং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন

৯. চাক ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন

১০. পাংখোয়া ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন

১১. লুসাই ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন

Scanned with OKEN Scanner

মুখবন্ধ

পার্বত্য চট্টগ্রাম হলো বাংলাদেশের মধ্যে বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা স্বীকৃত একমাত্র আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল। ঐতিহাসিক কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম এর শাসন ব্যবস্থা বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো হতে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। এ অঞ্চলের ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সমাজ ব্যবস্থা তাদের নিজ নিজ রীতিনীতি ও প্রথা অনুসারে পরিচালিত হয়। আদিবাসী প্রতিটি জনগোষ্ঠীর পারিবারিক ও সামাজিক বিরোধসমূহ এতদকাল পর্যন্ত আদিবাসীদের পুরুষাণুক্রমে লালিত ও যুগ যুগ ধরে তাদের সমাজে প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতির ভিত্তিতে নিষ্পন্ন হয়ে আসছে। ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৪০ বিধিতে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ও পার্বত্য জেলার সার্কেল চীফ এবং তাদের অধীনস্থ হেডম্যান ও কার্বারীগণ নিজ নিজ জনগোষ্ঠীর বিরোধসমূহের প্রতিকার বিধান করেন।

পরবর্তী সময়ে ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন (২০০৩ সনের ৩৮নং আইন) সংশোধিত আইনের ৪(৪) ধারা, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১নং আইন) এর ৬৬ ধারা, ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তি চুক্তির আওতায় প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন (১৯৯৮ সনের ১২নং আইন) এর ২২(ঙ) ধারাতে আদিবাসী সমাজে বিদ্যমান প্রথা ও রীতিনীতি ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থাকে আইনী স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আদিবাসী সমাজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিরোধসমূহ কিভাবে এবং কোন্ প্রক্রিয়ায় তিন পার্বত্য জেলায় প্রচলিত আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা এবং প্রথা ও রীতিনীতির ভিত্তিতে নিষ্পত্তি হয়ে আসছে এতদিন পর্যন্ত সে সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও গ্রন্থণার কাজ করা হয়নি। আদিবাসী সমাজে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত রীতিনীতি ও প্রথা অনুসারে তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক অধিকার সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান এবং সামাজিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার প্রচলিত ধারণা বর্তমান আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার সাথে অনেক ক্ষেত্রে অসঙ্গতিপূর্ণ। উপরন্তু জনগোষ্ঠী ভিত্তিক সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথাগত আইনের কোনো গ্রন্থণা বা প্রামাণ্য দলিল না থাকার কারণে এসবের অনুশীলন, চর্চা ও প্রায়োগিক দিকগুলোও দুর্বল রয়ে গেছে।

বিধিবদ্ধ আইনের দ্বারা স্বীকৃত আদিবাসী অধ্যুষিত তিন পার্বত্য জেলার ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতির অর্ন্তভূক্ত বিশেষ অধিকারসমূহ সংরক্ষণ শীর্ষক কার্যক্রমের আওতায় 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' এর সহায়তায় রাঙ্গামাটির বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'কপো সেবা সংঘ' পি.পি.আই.আর. প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো মাঠ পর্যায়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও গ্রন্থণার উদ্যোগ হাতে নেয়। প্রকল্পের আওতায় গত ২০০৫ সনের মার্চ হতে এক বছর মেয়াদী একটি গবেষণামূলক কার্যক্রম ২০০৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে সম্পন্ন হয়। এ প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা অনুসারে ৬

Scanned with OKEN Scanner

সদস্যের একটি গবেষণা টিম এবং জাতীয় পর্যায়ের একজন ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী ভিত্তিক ১১ জন পরামর্শককে এ কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। মাঠ পর্যায়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও অনুসন্ধান কার্যক্রমের পাশাপাশি কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে আদিবাসীদের প্রাচীন ধ্যান-ধারণায় প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতিসমূহ কিভাবে এবং কোন্ প্রক্রিয়ায় আইনের উৎস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। অনুরূপভাবে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টসহ নিম্ন আদালত, আদিবাসী তিন সার্কেল চীফ, মৌজা হেডম্যান ও কার্বারীর বিচারালয়ে যে সকল সিদ্ধান্ত এ যাবত প্রদান করা হয়েছে সেগুলোও পর্যালোচনায় এনেছি। এ সকল সিদ্ধান্ত ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিধিবদ্ধ আইনে প্রদত্ত ক্ষমতার ভিত্তি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫২নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আইনের সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যার অংশে প্রথা ও রীতিনীতি সম্পর্কিত ভাষ্য অনুসারে কতটুকু আইনী গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে এসবও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পার্বত্য জেলা পর্যায়ের ৩টি সেমিনারে আদিবাসী নেতৃবৃন্দের সুপারিশ অনুসারে এক বছরের কার্যক্রমে ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক-পৃথকভাবে গ্রন্থিত 'ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন' শিরোণামের গ্রন্থণাসমূহকে অবিতর্কিত, অভিন্ন ও সর্বজনগ্রাহ্য করার লক্ষ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম দ্বিতীয় মেয়াদে ২০০৬ সনের জুন মাস হতে ২০০৭ সনের মে মাস পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

প্রকল্পের দ্বিতীয় মেয়াদের কার্যক্রমে সম্প্রদায়ভিত্তিক স্থানীয় পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক-পৃথকভাবে ১১টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। দ্বিতীয় মেয়াদের কার্যক্রমে অবিতর্কিত বিষয়সমূহ গ্রন্থণার ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়। এতদসত্বেও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর গোত্র, উপ-গোত্র ভেদে সামাজিক আচার ও রীতিনীতির কিছু কিছু ব্যতিক্রম পর্যবেক্ষণে আসে। দ্বিতীয় মেয়াদের কার্যক্রমের সবচাইতে উলেখযোগ্য দিক হলো যে, তিন পার্বত্য জেলার মারমা সমাজে কেবলমাত্র বোমাং সার্কেলের নারীরা পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতো। চাকমা এবং মং সার্কেলের নারীরা এতদিন পর্যন্ত পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত ছিল। প্রকল্পের কর্মশালায় মারমা জনগোষ্ঠীর তিন সার্কেলের প্রতিনিধিগণ নারীর উত্তরাধিকার প্রশ্নে ঐক্যমতে পৌঁছাতে সক্ষম হন। অনুরূপভাবে চাকমা সমাজের নেতৃবৃন্দও চাকমা সার্কেল চীফের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় পৈত্রিক সম্পত্তিতে নারীকে উত্তরাধিকার প্রদানের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

প্রকল্প কার্যক্রমে ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক-পৃথকভাবে 'ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন' গ্রন্থণার সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচার ব্যবস্থার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বর্ণণার সাথে সাথে ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে, বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণীয় অভিন্ন প্রথা ও রীতিনীতিসমূহ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, দত্তক, স্ত্রীর মর্যাদা, পিতৃত্ব, নাবালকের অভিভাবকত্ব, দান, উইল, ভরনপোষণ এ সকল বিষয়ে প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতির আইনী প্রক্রিয়া ও

Scanned with OKEN Scanner

পদ্ধতি বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রাচীন ও আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার ধ্যান-ধারণার আলোকে প্রথা ও রীতিনীতির যুগোপযোগী অবস্থান নির্ণয়ে সচেতন থেকে আমরা গ্রন্থণার কাজ শেষ করেছি।

শত শত বছরের প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় স্মৃতি ও শ্রুতি নির্ভর সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথাসমূহের লিখিত কোনো দলিল বা গ্রন্থ না থাকার কারণে প্রচলিত আদালতে প্রতিকার বা প্রতিবিধানের ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। বর্তমানে ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর 'ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন' গ্রন্থণার সুবাদে এ ধরণের প্রতিবন্ধকতা নিরসনের দ্বারা সামাজিক সুশাসন ও সুবিচারের পথ সুগম হবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। অধিকন্তু পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর 'ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইনে' বিচার পদ্ধতির ব্যাপারে প্রবিধান প্রণয়নও সহজ হবে। এ অঞ্চলের ১১টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজ জীবনের শাসন-শৃঙ্খলা ও স্বকীয় বিচার ব্যবস্থাকে সুসংহত করার ক্ষেত্রে গবেষণাধর্মী ১১টি গ্রন্থ একেকটি মাইলফলক ও উন্নয়নবান্ধব হিসেবে চিহ্নিত হবে।

বর্তমানে তিন পার্বত্য জেলায় দেশী ও বিদেশী অর্থায়নে ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর তিন স্তর বিশিষ্ট ঐতিহ্যবাহী নেতৃত্বকে পরিবেশ ও উন্নয়ন বান্ধব যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। আদিবাসী ১১টি জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী সমাজপতি, জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দকে অন্তর্ভূক্ত করে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের প্রথা ও রীতিনীতির যুগোপযোগী প্রয়োগ ও চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হবে, যার সুবাদে এ অঞ্চলের সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত হয়ে মানবাধিকার, নারী ও শিশু অধিকার, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রকল্প কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল হবে। অনুরূপভাবে সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে তিন পার্বত্য জেলায় চলমান উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মকান্ডে আদিবাসী সমাজের ঐতিহ্যগত প্রথা ও রীতিনীতি সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠবে। দেশের সুশীল সমাজসহ পার্বত্যাঞ্চলের সমাজ সচেতন নেতৃবৃন্দের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী এবং গঠনমূলক চিন্তা-চেতনা এই কার্যক্রমের একমাত্র পাথেয় হবে, এই প্রত্যাশা রইলো।

এডভোকেট প্রতিম রায়
প্রকল্প সমন্বয়কারী

Scanned with OKEN Scanner

আমরা কৃতজ্ঞ

পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সমাজ কাঠামো মূলতঃ তাদের প্রথা ও রীতিনীতি নির্ভর। প্রতিটি জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি, সামাজিক বন্ধন, গোত্র বিভাজন, প্রাচীন ধ্যান-ধারণা, মনন ও লোকবিশ্বাস, মূল্যবোধ, লোকাচার-অভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, এসবের স্বকীয় স্বাতন্ত্র বিদ্যমান। ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানস সংস্কৃতির বৈচিত্রময় সেই জৌলুস অবশ্য বর্তমানে নিস্প্রভ। সভ্যতার বিবর্তন, ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়াসহ নানাবিধ কার্যকারণে আদিবাসী সমাজ জীবনের আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব, নৃত্যগীতের অনেক বর্ণাঢ্য উপাদান এখন ম্রিয়মান। আদিবাসী সমাজের রীতিনীতি ও প্রথা নির্ভর তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন সম্পর্কিত কোনো লিখিত দলিল বা গবেষণা গ্রন্থের অনুপস্থিতির কারণই এজন্য অনেকটা দায়ী বলা চলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী সমাজের অপেক্ষাকৃত অগ্রসর কয়েকটি জনগোষ্ঠীর শিক্ষিত ও সমাজ সচেতন মানুষের ইতিহাস মনস্ক গবেষণাধর্মী কিছু সাহিত্য কর্মের সুবাদে তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনেকখানি সুরক্ষিত হয়েছে। অনগ্রসর ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলো এক্ষেত্রে বরাবরই অবহেলিত থাকার কারণে বিশেষতঃ ধর্মান্তর প্রক্রিয়ার প্রভাবে তাদের মানস সংস্কৃতি বিবর্ণ হয়েছে বেশী। তাসত্বেও স্বকীয় জীবন ব্যবস্থা, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে এ সকল আদিবাসী মানুষ তাদের সংস্কৃতির স্বাতন্ত্রকে এখনো আঁকড়ে রেখেছে নিজস্ব বিশ্বাসে।

যদিও ১৯০০ সনের চিটাগং হিলট্র্যাক্টস রেগুলেশন ও হিল ম্যানুয়েলে আদিবাসীদের প্রথা ও রীতিনীতিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোনোভাবে তা আদিবাসী ঐতিহ্যের রক্ষাকবচ হয়ে উঠতে পারেনি। এছাড়াও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রণীত তিন পার্বত্য জেলা (স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) পরিষদ আইন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন' ১৯৯৮, পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি সংশোধনী (২০০৩ সনের ৩৮নং আইন) আইন ও ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন এসবের প্রয়োগেও আদিবাসীদের প্রথা ও রীতিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ধারণা হয়, লিখিত আকারে আদিবাসী সমাজের প্রথা ও রীতিনীতির যথাযথ সংরক্ষণ, যুগোপযোগী অনুশীলন ও কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রটি বরাবরই উপেক্ষিত হয়েছে। যার কারণে এই অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত আদিবাসী সমাজ কাঠামো ও নিজস্ব বিচার ব্যবস্থায় প্রতিকুলতার উদ্ভব হয়েছে।

বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কপো সেবা সংঘ, রাঙ্গামাটির উদ্যোগে প্রথমবারের মতো ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রীতিনীতি ও প্রথা কেন্দ্রিক ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন গ্রন্থণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ২০০৫ সনে। প্রথম পর্যায়ে মার্চ '০৫ হতে ফেব্রুয়ারী '০৬ পর্যন্ত এক বছর মেয়াদের একটি গবেষণাধর্মী প্রকল্প কার্যক্রমের আওতায় ১১টি জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক-পৃথকভাবে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন গ্রন্থণার কাজ শেষ হয়। তিন পার্বত্য জেলার আদিবাসী সমাজের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের মতামত ও সুপারিশের আলোকে পুনরায় জুন '০৬ হতে মে '০৭ পর্যন্ত দ্বিতীয় মেয়াদে আরো এক বছর বর্ধিত

Scanned with OKEN Scanner

কার্যক্রমের আওতায় ১১টি গ্রন্থণার অধিকতর সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে শুদ্ধতা আনা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১টি আদিবাসী সমাজের প্রাচীন রীতিনীতি ও প্রথাকে বর্তমান আধুনিক প্রজন্মের চিন্তা চেতনার সাথে সমন্বয় করে সময়োপযোগী গ্রন্থণার কার্যক্রমটি নিঃসন্দেহে বিশাল এক কর্মযজ্ঞের সূচনা। সেক্ষেত্রে 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' এ অঞ্চলের আদিবাসী মানুষের জন্য একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে বলা যায়। অনুরূপভাবে কেয়ার বাংলাদেশ ও DFID এ দুটি প্রতিষ্ঠানের কাছেও আদিবাসী সমাজ কৃতজ্ঞ থাকবে।

দেশের বিশেষ এক সংকটময় মুহূর্তে তিন পার্বত্য জেলায় বিস্তৃত প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে আমরা বারবার উজ্জিবিত হয়েছি স্থানীয় প্রশাসনসহ সমাজের স্বর্বস্তরের নেতৃবৃন্দের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়ে। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, চাকমা সার্কেল, বোমাং সার্কেল ও মং সার্কেল চীফগণ, তৃণমূল পর্যায়ের ইউপি চেয়ারম্যান, হেডম্যান, কার্বারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠীভিত্তিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহের নেতৃবৃন্দ, সচেতন নারীনেত্রী, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান প্রেসক্লাবসহ কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দ, সেন্টার ফর হিল ইনফরমেশন ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিসোর্চ (চিয়ার্স) এবং গ্রীনহিল এই প্রকল্প কার্যক্রমে সহযোগিতা ও অনপ্রেরণা যুগিয়ে আমাদের কর্মস্পৃহাকে বেগবান করেছেন। পাশাপাশি তাদের সুচিন্তিত মতামত, পরামর্শ, সুপারিশ ও দিক-নির্দেশনার সুবাদে একটি দূরূহ কার্যক্রমের অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছুতে আমরা সক্ষম হয়েছি। একই সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সহৃদয়তার প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞ। উপরন্তু দেশের রাজনৈতিক সংকটকালে তিন পার্বত্য জেলার প্রত্যন্ত জনপদ জুড়ে প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনায় উদ্ভূত প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠার ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের সেনা রিজিয়ন কর্তৃপক্ষ ও সেনা জোন কর্তৃপক্ষের মনোযোগ ও সুদৃষ্টির প্রতি আমরা সকৃতজ্ঞ। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য-সহযোগিতায় আরো অনেকে আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন, স্থানাভাবের কারণে যা বিস্তৃত করা সম্ভব হচ্ছে না বলে ক্ষমাপ্রার্থী। এ কথা সত্য যে, এই অঞ্চলের সমাজ ব্যবস্থায় সুশাসন ও ন্যায় বিচারসহ মানবাধিকার এবং নারী ও শিশু অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে আদিবাসী ১১টি জনগোষ্ঠীর 'ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন' গ্রন্থণার উদ্যোগ মূলতঃ সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ের সকল মহলের আন্তরিক সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়েছে। কপো সেবা সংঘের পি.পি.আই.আর. প্রকল্প কার্যক্রমের আওতায় এ অঞ্চলে একটি বিশাল কর্মযজ্ঞের শুভ সূচনা যেমন হয়েছে তেমনি সফল পরিসমাপ্তিরও প্রয়োজন রয়েছে, অসমাপ্ত অধ্যায়ের যবনিকা উদঘাটন করে। এ বিষয়ে পার্বত্যাঞ্চলের সমাজহিতৈষী ও শুভাকাঙ্খি সকল পক্ষের ঐকান্তিক সহযোগিতা, সমর্থন এবং সচেতন উপলব্ধিকে আমরা স্মরণ করি সকৃতজ্ঞতায়।

শৈলেন দে
প্রোগ্রাম অর্গানাইজার

Scanned with OKEN Scanner

শুভেচ্ছা বাণী

পৃথিবীর অন্যত্র আদিবাসী জাতিসমূহের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাহাড়ী জাতিসমূহের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন সংশিষ্ট প্রথা অনুসরণ করে অলিখিতভাবে প্রচলিত হয়ে আসছে। উপরোক্ত আইন প্রথা নির্ভর হওয়ার কারণে সংশিষ্ট সম্প্রদায়ের সম্মতিক্রমে ও যুগের প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তিত অবস্থায় প্রচলিত হওয়ার সুবিধা রয়েছে। কিন্তু উপরোক্ত আইনসমূহের ব্যাপারে পর্যাপ্ত গবেষণা ও প্রকাশনা (যথাঃ Legal Compendium, Legal Commentary, Treatise, Law Report, প্রবন্ধ ইত্যাদি) না থাকার কারণে উক্ত আইন সম্পর্কে তথ্য ও তত্ত্ব উদঘাটন করা কষ্টসাধ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন সংক্রান্ত মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় 'কপো সেবা সংঘে'র গবেষণা ও প্রকাশনার উদ্যোগটি অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

আমি আশা করি এই প্রকাশনাটির মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তি, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান (যথাঃ রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ, আইনজীবী, গবেষক, বিচারক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সমাজ ও মানবাধিকার কর্মীগণ) তাদের স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে পাহাড়ীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারবেন।

আমি এ প্রকাশনাটির সফলতা কামনা করি।

রাজা দেবাশীষ রায়
চাকমা সার্কেল চীফ

Scanned with OKEN Scanner

শুভেচ্ছা বাণী

ভিন্ন ভাষাভাষি ১১টি নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এই পার্বত্য চট্টগ্রাম (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান) ব্রিটিশ থেকে বাংলাদেশ শাসনামল পর্যন্ত বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি বহন করছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধিসহ পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ইত্যকার বেশ কিছু আইন শুধুমাত্র এ তিন পার্বত্য জেলায় প্রচলিত থাকায় এ অঞ্চলের প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা মূলতঃ দেশের সমতল অঞ্চলের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। বিশেষতঃ প্রতিটি নৃগোষ্ঠীর প্রথা ও রীতিভিত্তিক সমাজ কাঠামোকে সার্কেল চীফ, হেডম্যান, কার্বারী এ তিনটি প্রাতিষ্ঠানিক স্তরের বিচার কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রণের আইনস্বীকৃত ব্যবস্থা বিদ্যমান, যা দেশের অন্য কোথাও নেই। দেশের প্রচলিত ও বিধিবদ্ধ আইনে পার্বত্য অঞ্চলে প্রচলিত এ সকল প্রথা ও রীতিনীতিকে স্বীকৃতি প্রদান করা হলেও ১১টি জনগোষ্ঠীর প্রথা ও রীতিনীতি সম্পর্কিত লিখিত কোনো দলিল বা গ্রন্থ এ যাবতকাল রচিত হয়নি। যে কারণে প্রচলিত আদালতসহ সামাজিক বিচার কাঠামোয় সুশাসন ও সুবিচারের প্রশ্নে অনেক সময় অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে থাকে। কেননা প্রতিটি নৃগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনাচারে যেমন স্বকীয়তা বিদ্যমান তেমনি ঐতিহ্যগত প্রথা, রীতিনীতিতেও স্বাতন্ত্র বিদ্যমান। অনুরূপভাবে গোত্র উপগোত্রভেদে এবং অঞ্চলভেদে গড়ে ওঠা আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থায়ও জনগোষ্ঠীভিত্তিক স্বকীয়তা বজায় রেখে প্রথা ও রীতিনীতির অনুসরণ হয়ে থাকে।

আমি আনন্দিত যে, বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কপো সেবা সংঘ, রাঙ্গামাটির উদ্যোগে একটি গবেষণাধর্মী প্রকল্প (পি.পি.আই.আর.) কার্যক্রমের আওতায় প্রথমবারের মতো এ অঞ্চলের ১১টি জনগোষ্ঠীর প্রথা ও রীতিনীতিভিত্তিক পৃথক-পৃথকভাবে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন গ্রন্থণার কাজ সুসম্পন্ন করা হয়েছে। এই দুরূহ কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে এ অঞ্চলের ১১টি জনগোষ্ঠীর সমাজ বিকাশের ধারায় একটি মাইলফলক সৃষ্টি হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। মেধা, শ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা এই দুরূহ গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থায় সুশাসন ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী সুফল বয়ে আনবে। বিশেষভাবে উলেখ করা প্রয়োজন, এতকাল কেবলমাত্র বোমাং সার্কেলে বসবাসকারী মারমা সমাজে প্রচলিত প্রথা অনুসারে কন্যা সন্তানেরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের যে রীতি অনুসৃত হয়ে আসছিল,

Scanned with OKEN Scanner

এই প্রকল্প কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত কর্মশালার মাধ্যমে মং ও চাকমা সার্কেলেও অনুরূপ প্রথা অনুসরণের বিষয়ে তিন সার্কেলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন। যুগান্তকারী এই সিদ্ধান্তটি চাকমা, মং ও বোমাং সার্কেলে কার্যকর হলে আদিবাসী নারীর উত্তরাধিকার লাভের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমি মনে করি। আদিবাসী নারী ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কপো সেবা সংঘের পি.পি.আই.আর. প্রকল্প অত্যন্ত শক্তিশালী ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। এ অঞ্চলের ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক-পৃথকভাবে গ্রন্থিত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন অভিন্নভাবে তিন পার্বত্য জেলায় অনুসরণের লক্ষ্যে প্রকল্প কার্যক্রমের আওতায় হেডম্যান ও কার্বারীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি। এ ধরণের প্রশিক্ষণের দ্বারা হেডম্যান ও কার্বারীদের পক্ষে জনগোষ্ঠীভিত্তিক প্রথা ও রীতিনীতি সম্পর্কিত বিচারিক ধ্যান-ধারণা অর্জনের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব হবে। এছাড়াও ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন সম্পর্কে ইতোপূর্বে অস্পষ্টতার কারণে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় উদ্ভূত বিরোধ নিরসনের ক্ষেত্রে যে সকল বিচারিক সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে এই গ্রন্থণার সুবাদে তা নিরসনের পথ প্রসস্থ হবে। ঐতিহাসিক পার্বত্য চুক্তির আওতায় প্রণীত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের সংশোধনী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনে আদিবাসীদের সামাজিক বিরোধ নিস্পত্তির জন্য বিধি ও প্রবিধান প্রণয়নের সুযোগ রয়েছে। কপো সেবা সংঘের প্রকাশিত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন গ্রন্থণাসমূহকে অনুরূপ বিধি ও প্রবিধান আকারে স্বীকৃতির বিষয়টি সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের সক্রিয় বিবেচনায় আনা প্রয়োজন রয়েছে। ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পৃথক-পৃথক ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন গ্রন্থণা এ অঞ্চলের সমাজ সচেতন মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবে বলে আশা করি। 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' এর সহযোগিতায় 'কপো সেবা সংঘ' রাঙ্গামাটির গবেষণাধর্মী এই প্রকল্পের আরও কার্যকর ভবিষ্যৎ সাফল্য কামনা করি।

অং শৈ প্রু চৌধুরী
বোমাং সার্কেল চীফ

শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের পার্বত্য চট্টগ্রামে ভিন্ন ভাষাভাষি ১১টি নৃগোষ্ঠির বসবাস। প্রতিটি নৃগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনাচারে যেমন স্বকীয়তা বিদ্যমান তেমনি ঐতিহ্যগত প্রথা ও রীতিনীতিতে স্বাতন্ত্র বিদ্যমান। জনগোষ্ঠীভিত্তিক গোত্র উপগোত্রভেদে এবং অঞ্চলভেদে গড়ে ওঠা আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থায়ও স্বকীয়তা বজায় রেখে প্রথা ও রীতিনীতির অনুসরণ করা হয়।

ব্রিটিশ থেকে বাংলাদেশ শাসনামল পর্যন্ত আদিবাসী অধ্যুষিত বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের মর্যাদা অক্ষুন্ন রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধিসহ পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ইত্যকার বেশ কিছু আইন শুধুমাত্র পার্বত্য তিন জেলায় প্রচলিত থাকার সুবাদে এ অঞ্চলের প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা মূলতঃ দেশের সমতল অঞ্চলের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। বিশেষতঃ প্রতিটি নৃগোষ্ঠীর প্রথা ও রীতিভিত্তিক সমাজ কাঠামোকে সার্কেল চীফ, হেডম্যান, কার্বারী এ তিনটি প্রাতিষ্ঠানিক স্তরের বিচার কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রণের আইনস্বীকৃত ব্যবস্থা বিদ্যমান। দেশের প্রচলিত ও বিধিবদ্ধ আইনে পার্বত্য অঞ্চলে প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতিকে স্বীকৃতি প্রদান করা হলেও ১১টি জনগোষ্ঠীর প্রথা ও রীতিনীতি সম্পর্কিত লিখিত কোনো দলিল বা গ্রন্থ এ যাবতকাল রচিত হয়নি। যে কারণে প্রচলিত আদালতসহ সামাজিক বিচার কাঠামোয় সুশাসন ও সুবিচারের প্রশ্নে অনেক সময় অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে থাকে।

বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কপো সেবা সংঘ, রাঙ্গামাটির উদ্যোগে একটি গবেষণাধর্মী প্রকল্প (পি.পি.আই.আর.) কার্যক্রমের আওতায় প্রথমবারের মতো ১১টি জনগোষ্ঠীর প্রথা ও রীতিনীতিভিত্তিক পৃথক-পৃথকভাবে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন গ্রন্থণার কাজ সুসম্পন্ন করা হয়েছে, যা এ অঞ্চলের ১১টি জনগোষ্ঠীর সমাজ ব্যবস্থায় একটি মাইলফলক সৃষ্টি হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। মেধা, শ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে এই দুরূহ গবেষণা কার্যক্রমের সুবাদে এ অঞ্চলের আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থায় সুশাসন ও সুবিচার প্রতিষ্ঠায় যুগান্তকারী সুফল বয়ে আনবে। বিশেষভাবে উলেখ করা প্রয়োজন, এতকাল কেবলমাত্র বোমাং সার্কেলে বসবাসকারী মারমা সমাজে প্রচলিত প্রথা অনুসারে কন্যা সন্তানেরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের যে রীতি অনুসৃত হয়ে আসছিল, এই প্রকল্প কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত কর্মশালার মাধ্যমে মং ও

Scanned with OKEN Scanner

চাকমা সার্কেলেও অনুরূপ প্রথা অনুসরণের বিষয়ে তিন সার্কেলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন। যুগান্তকারী এই সিদ্ধান্তটি চাকমা, মং ও বোমাং সার্কেলে কার্যকর হলে আদিবাসী নারীর উত্তরাধিকার লাভের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমি মনে করি। আদিবাসী নারী ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কপো সেবা সংঘের পি.পি.আই.আর. প্রকল্প অত্যন্ত শক্তিশালী ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। এ অঞ্চলের ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক-পৃথকভাবে গ্রন্থিত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন অভিন্নভাবে তিন পার্বত্য জেলায় অনুসরণের লক্ষ্যে প্রকল্প কার্যক্রমের আওতায় হেডম্যান ও কার্বারীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি। এ ধরণের প্রশিক্ষণের দ্বারা হেডম্যান ও কার্বারীদের পক্ষে জনগোষ্ঠীভিত্তিক প্রথা ও রীতিনীতি সম্পর্কিত বিচারিক ধ্যান-ধারণা অর্জনের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব হবে। এছাড়াও ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন সম্পর্কে ইতোপূর্বে অস্পষ্টতার কারণে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় উদ্ভূত বিরোধ নিরসনের ক্ষেত্রে যে সকল বিচারিক সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে এই গ্রন্থণার সুবাদে তা নিরসনের পথ প্রসস্থ হবে। ঐতিহাসিক পার্বত্য চুক্তির আওতায় প্রণীত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের সংশোধনী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনে আদিবাসীদের সামাজিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিধি ও প্রবিধান প্রণয়নের সুযোগ রয়েছে। কপো সেবা সংঘের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন গ্রন্থণাসমূহকে অনুরূপ বিধি ও প্রবিধান আকারে স্বীকৃতির বিষয়টি সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের সক্রিয় বিবেচনায় আনা প্রয়োজন রয়েছে। এ কার্যক্রমের বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়ে প্রকল্পের গবেষকদের সহযোগিতা দিতে পেরে আমি আনন্দিত। ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পৃথক-পৃথক ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন গ্রন্থণা এ অঞ্চলের সমাজ সচেতন মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবে বলে আশা করি। 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' এর সহযোগিতায় 'কপো সেবা সংঘ' রাঙ্গামাটির একটি যুগোপযোগী সাহসী পদক্ষেপের জন্য সংশিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পাই হ্লা প্রু চৌধুরী
মং সার্কেল চীফ

শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশে বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বাস। তাদের সঠিক সংখ্যা নিয়ে এখনো বিভ্রান্তি রয়েছে। বিশেষ করে সরকারী ও বে-সরকারী হিসাবের মধ্যে এ পার্থক্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তবে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল যে আদিবাসী জনগোষ্ঠী দ্বারাই প্রধানতঃ অধ্যুষিত- এ ব্যাপারে কোনো মতান্তর নেই। এতদঅঞ্চলের এগারটি জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন হচ্ছে উপস্থাপিত পুস্তকের বিষয়বস্তু।

যে সকল জনগোষ্ঠীকে নিয়ে এই বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে গর্ব করার মতো ঐতিহ্য, প্রথা, রীতিনীতি, বিশ্বাস ও জীবন পদ্ধতি। যার মূল প্রথিত আছে সুদূর অতীতে। এটি যে কোনো সনাতনী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। প্রশাসনিকভাবে, বিশেষ করে ব্রিটিশ উপনিবেশকালের সময় থেকে, এ সকল জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় আইনের কাঠামোভূক্ত করা হলেও, শাসকগোষ্ঠী তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় সম্পর্কে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেনি। অনুসৃত এ নীতি সকল পক্ষের জন্যই মঙ্গলজনক ছিল বলে আজও প্রতিয়মান হয়।

কালের পরিক্রমায় অনেক পরিবর্তন গ্রাস করেছে এই পাহাড়ী অঞ্চলকে- অনেক কিছুই ঘটেছে সামাজিক বিবর্তনের সাধারণ নিয়মে। কিন্তু অন্য অনেক কিছুই ঘটানো হয়েছে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদদে এবং রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক শক্তি (অপ) ব্যবহার করে। সমতল ভূমির বাঙ্গালীর আগমন, বসতি স্থাপন ও সম্প্রসারণে পাহাড়ি-বাঙ্গালি জনসংখ্যার অনুপাত যেমন ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেছে, তেমনি যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপবিক পরিবর্তনের কারণে আন্তঃ জনগোষ্ঠী সম্পর্কেও জোয়ারের ধাক্কা লেগেছে। যে গোষ্ঠী কোনো একসময়ে ছিল নিতান্তই অন্তর্মূখী ও অল্পতেই তুষ্ট, সেই গোষ্ঠী-ই হয়ে পড়েছে অনেকটাই বহির্মূখী ও বাজার নিয়ন্ত্রিত অতৃপ্ত এক ভোক্তা। অর্থনৈতিক সম্পদহারা অবধারিত ও অমোঘ নিয়মে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর অন্তঃ ও আন্তঃ (Intra & Intro)-উভয় প্রকার সম্পর্কের অতি সম্প্রসারণ আজ আর কারও কাছে বেখাপ্পা ঠেকে না। এই পরিক্রমায় অনেক কিছুই বদলালেও একটি স্থানে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর সনাতনী চরিত্র প্রায় অম্লান থেকেছে- তা হলো পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে নিজস্ব ঐতিহ্য, প্রথা ইত্যাদির একক নিয়ামক ভূমিকা।

যে প্রথা, বিশ্বাস, রীতিনীতি বা ঐতিহ্য দিয়ে সামাজিক সম্পর্কের বিশাল ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রিত হতো ও হচ্ছে- তা কিন্তু বরাবরই থেকেছে অলিখিত এবং বহুলাংশে অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট (Uncertain)। এমতাবস্থায়, যতক্ষণ পর্যন্ত স্থানীয় কোনো সমস্যার নিয়ন্ত্রণ (সামাজিক নিয়ন্ত্রণ) রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে ক্ষুন্ন করেনি, রাষ্ট্র তার আপাতঃ নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছে এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ না করাটাই অধিকতর শ্রেয় মনে করেছে। কিন্তু যখনই রাষ্ট্র মনে করেছে যে তার স্বার্থ হুমকির সম্মুখীন, তখনি অপার নিরপেক্ষতা বিসর্জন দিয়ে রাষ্ট্র তার স্বাভাবিক আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং আদিবাসী প্রথা অলিখিত ও অনির্দিষ্ট দ্বারা অনুসৃত, তা বিবেচনায় না নিয়ে রাষ্ট্রীয় পজিটিভ আইন প্রণয়নে সচেষ্ট থেকেছে। এরূপ আচরণ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'সুবিধাজনক' মনে হলেও মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইন পরিপন্থী ও তাই অবশ্যই পরিত্যাজ্য। যে কোনো আদিবাসী জনগোষ্ঠীর, তা সংখ্যায় যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন- বিশেষাধিকার বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইন কর্তৃক স্বীকৃত।

Scanned with OKEN Scanner

তদুপরি, বাংলাদেশ একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র- এই রাষ্ট্রে যদি মুসলমান, হিন্দু বা খ্রিষ্টানদের ক্ষেত্রে নিজস্ব ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন প্রযোজ্য হতে পারে, বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন প্রয়োগে কোনো বাধা থাকতে পারে না। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রথাগত আইনের বৈধতায় রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি অপরিহার্য।

উপস্থাপিত এই পুস্তকে পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত আইন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যে প্রক্রিয়ায় এই কাজটি সম্পাদিত হয়েছে, তা ভূমিকায় বর্ণনা করা হয়েছে। আমার দৃষ্টিতে গোষ্ঠীবাসীর অংশগ্রহণে স্বীয় পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল অ-বিতর্কিত বিধানাবলীর লিখিত একত্রীকরণ একটি মৌলিক ও অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রথাগত আইনের 'অস্পষ্টতা ও অলিখিত রূপ'- যা এরূপ আইনের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে মনে করা হতো, এই কাজের মাধ্যমে তা বহুলাংশে দূরীভূত হলো। পুস্তকাকারে বিবৃত ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন যে স্পষ্ট, লিখিত ও নির্দিষ্ট- তা আমরা জোর গলায় দাবী করতে পারি। সুদুরপ্রসারী এই অমূল্য কাজ সম্পাদনের জন্য এই প্রকল্পের সাথে সংশিষ্ট সকলকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

প্রথার সংকলন ও লিখিত রূপ প্রদান বড় মাপের কাজ হলেও আমার দৃষ্টিতে তার কোনো সামাজিক মূল্য থাকে না যদি কিনা এরূপ কাজের প্রায়োগিক দিকটি অবহেলিত থাকে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি লিখিত প্রথার যে সংকলন প্রস্তুত হয়েছে তার ভিত্তিতে সংশিষ্ট জনগোষ্ঠীর হেডম্যান, সার্কেল চীফ, কার্বারীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন। এর ফলে আইনের সম্প্রসারণ ও সমব্যাখ্যা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে যার অনুপস্থিতিতে ন্যায় বিচার ও শাসন তামাশায় রূপান্তরিত হতে পারে। এ দিক থেকে বিচার করলে বর্তমান কাজটি আরও দুরূহ অথচ অপরিহার্য বড় কাজের শুরু মাত্র। শুধু তাহলেই বর্তমান এই কাজের সার্থকতা থাকবে।

যে তরুন গবেষক দল (দু'একজন বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও, চিন্তা-চেতনায় তাঁরা যে কোনো তরুণের সমতূল্য) এই অসাধ্য কাজটি সাধন করেছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।

জাতীয় পরামর্শক হিসেবে এই প্রকল্পের সাথে আমিও যুক্ত ছিলাম। কাজটি করতে গিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্বার সভ্যতা, মনন ও চেতনার যে পরিচয় আমি পেয়েছি তা আমাকে অবাক করেছে- বিশেষ করে নারী ও শিশুদের প্রতি তাদের যে মমত্ববোধ ও দায়িত্ববোধ তা বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ট বাঙ্গালীর জন্য শিক্ষা হিসেবে কাজ করতে পারে।

এই প্রকল্পে আমার অবদান নিতান্তই সামান্য। কিন্তু এই অসামান্য কাজের সাথে যুক্ত থাকতে পারায় আমি গর্বিত বোধ করছি।

অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান
মূখ্য পরামর্শক

Scanned with OKEN Scanner

শুভেচ্ছা বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বসবাসরত ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী, সামগ্রিকভাবে যারা জুম্ম জনগোষ্ঠী বলে পরিচিত। এরা হলো চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, বম, খুমি, খিয়াং, চাক, পাংখোয়া ও লুসাই। ঐতিহাসিক কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন ব্যবস্থা ব্যতিক্রমধর্মী। ব্যতিক্রমধর্মী শাসন ব্যবস্থার মাঝেই ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী তাদের সাংস্কৃতিক এবং নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য নিয়ে বসবাস করে। আদিবাসীদের ঐতিহ্যগতভাবে লালিত ও যুগ যুগ ধরে তাদের সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতির ভিত্তিতে তারা নিজেদের পারিবারিক ও সামাজিক বিরোধের নিষ্পত্তি করে থাকে।

'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডারের সাথে পর্যায়ক্রমিক পরামর্শ সভার মাধ্যমে ২০০৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কার্যক্রম শুরু করে। অনুমোদিত অনুদান প্রদানের যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সম্মতিক্রমে 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' স্থানীয় সংগঠনকে সহযোগী সংস্থা হিসেবে কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করে। এদের মাঝে 'কপো সেবা সংঘ' ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রথাগত আইন গ্রন্থণার একটি কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, যা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ মনে করে যে, এই উদ্যোগ তাদের প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতি সংরক্ষণ করবে। এটি বিরোধ মীমাংসাতেও গ্রহণযোগ্য পুস্তকের ভূমিকা পালন করবে, কারণ আদিবাসী জনগণ এসব আইন অনুসরণ করতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' এই উদ্যোগকে সমর্থন দিচ্ছে, কারণ জাতিসত্বা বা ধর্মগত পরিচয় নির্বিশেষে সকল জনগোষ্ঠীরই নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি এবং প্রথা অনুসরণ করার মৌলিক অধিকার রয়েছে।

আমি 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' এর পক্ষ থেকে এই মহৎ কাজে অংশগ্রহণকারী সকলকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

Shaheen Anam

শাহীন আনাম
নির্বাহী পরিচালক
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
ঢাকা

Scanned with OKEN Scanner

প্রথম পরিচ্ছেদ

পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন ও বিচার ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ

সূচীক্রম — পৃষ্ঠা ২৫

১.১	পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন ও বিচার ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ
১.২	সার্কেল চীফ/রাজা নিয়োগ/অভিষেক
১.৩	রাজ প্রথা
১.৪	রাজা
১.৫	রাজ্যাভিষেক/রাজপদে অভিষিক্তকরণ
১.৬	১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির আওতায় রাজার ক্ষমতা ও কার্যাবলী
১.৭	তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত ক্ষমতা
১.৮	মৌজা গঠন ও হেডম্যান পদ
১.৯	হেডম্যান নিয়োগ পদ্ধতি
১.১০	হেডম্যানের ক্ষমতা ও কার্যাবলী
১.১১	মৌজার প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্ব
১.১২	বসতবাড়ির জন্য খাসজমি বন্দোবস্তী/দখলে রাখার অনুমতি প্রদানের ক্ষমতা
১.১৩	ভূমি
১.১৪	হেডম্যান অপসারণ
১.১৫	সার্কেল চীফ ও হেডম্যানের বিচারিক ক্ষমতা
১.১৬	১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনের সংশোধনী আইন (২০০৩ সনের ৩৮নং আইন)
১.১৭	পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১নং আইন) ৬৬ ধারায় সার্কেল চীফ বা মৌজা প্রধান কর্তৃক বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধান
১.১৮	ব্যাখ্যা
১.১৯	কারবারী আদালত
১.২০	ব্যাখ্যা
১.২১	উল্লেখযোগ্য সামাজিক বিরোধ ও অপরাধসমূহ

Scanned with OKEN Scanner

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীঃ রীতিনীতি ও প্রথাগত আইনের উৎস

সূচীক্রম পৃষ্ঠা ৩৯

২.১	তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিতি
২.১.১	ব্যাখ্যা
২.১.২	গোত্র তালিকা
২.২	জন্ম, মৃত্যু, বিবাহে সামাজিক বাধ্যবাধকতা
২.২.১	শিশুর জন্মশুদ্ধি ও সামাজিক আচার
২.৩	বিবাহ রীতি
২.৩.১	তেম্মাং
২.৩.২	বউ পুছা গরানা
২.৩.৩	দাভা
২.৩.৪	সাজনী
২.৩.৫	বউ খজা যানা
২.৩.৬	জামাই তোলা
২.৩.৭	ল্লাত্তং বানা বা ফং গরানা
২.৩.৮	চুমুলাঙ পুজা
২.৩.৯	সেফ মাগানা
২.৩.১০	খানা সিরানা
২.৩.১১	বউ তুলানা
২.৩.১২	সেফ মাগা যানা
২.৪	সৎকার রীতি
২.৫	তঞ্চঙ্গ্যা সামাজিক রীতিনীতি
২.৫.১	পৈ-অ বাদ/জার-অ বাদ
২.৫.২	গাবুজ্যা দেবান
২.৫.৩	প্রথম সন্তান ভাদ্র মাসে ভুমিষ্ট হওয়া
২.৫.৪	পৈ
২.৫.৫	গৃহ নির্মাণ রীতি
২.৫.৬	আং
২.৫.৭	শুভাশুভ আচার
২.৫.৮	সুতিকাগার
২.৬	ধর্মীয় বিশ্বাস ও তঞ্চঙ্গ্যা সামাজিক প্রথা
২.৭	তঞ্চঙ্গ্যা প্রথাগত আইনের উৎস
২.৮	তঞ্চঙ্গ্যা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন প্রয়োগের অধিক্ষেত্র
২.৯	তঞ্চঙ্গ্যা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন যার উপর প্রযোজ্য নয়

Scanned with OKEN Scanner

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সূচীক্রম **বিবাহ** পৃষ্ঠা ৫৪

৩.১	বিবাহের সংজ্ঞা
৩.২	বিবাহের যোগ্যতা
৩.৩	তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ সম্পর্ক
৩.৪	বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের কতিপয় অনুসরণীয়/পালনীয় রীতিনীতি
৩.৫	বিবাহের প্রকারভেদ
৩.৬	সামাজিক/নিয়মিত বিবাহ
৩.৭	সামাজিক/নিয়মিত বিবাহের আইনগত ফলাফল
৩.৮	পলায়ন/অনিয়মিত বিবাহ
৩.৯	কোর্ট ম্যারেজ
৩.১০	ব্যাখ্যা
৩.১১	মিশ্র বিবাহ
৩.১২	পলায়ন/অনিয়মিত বিবাহের আইনগত ফলাফল
৩.১৩	দেশের প্রচলিত আইনে মামলা ও সাজা
৩.১৪	অসাঙ্যা/নিষিদ্ধ বা অননুমোদিত বিবাহ
৩.১৫	অসাঙ্যা/নিষিদ্ধ বা অননুমোদিত বিবাহের আইনগত ফলাফল
৩.১৬	ব্যাখ্যা
৩.১৭	বিধবা বিবাহ
৩.১৮	বহু বিবাহ
৩.১৯	মন্তব্য
৩.২০	বহু বিবাহের আইনগত ফলাফল
৩.২১	মন্তব্য
৩.২২	বিবাহের প্রমাণ
৩.২৩	ব্যাখ্যা
৩.২৪	বৈবাহিক কর্তব্য
৩.২৫	আইনসঙ্গত বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও দায়িত্ব

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবাহ বিচ্ছেদ পৃষ্ঠা ৬৩

৪.১	বিবাহ বিচ্ছেদ
৪.২	বিবাহ বিচ্ছেদের বিভিন্ন পদ্ধতি
৪.৩	স্বামী বা স্ত্রীর বিচ্ছেদ দাবী করার অধিকার
৪.৪	ছাড়াছাড়ি/বিবাহ বিচ্ছেদের আইনগত ফলাফল
৪.৫	ছাড়াছাড়ি/বিচ্ছেদ সম্পাদনকালে স্ত্রীর অন্তঃসত্ত্বা বা গর্ভবতী অবস্থা

Scanned with OKEN Scanner

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সূচীক্রম	উত্তরাধিকার	পৃষ্ঠা ৬৬
৫.১	তঞ্চঙ্গ্যা উত্তরাধিকার প্রথার উদ্ভব	
৫.২	তঞ্চঙ্গ্যা উত্তরাধিকারের সাধারণ নীতি	
৫.৩	উত্তরাধিকার সম্পত্তি কি কি	
৫.৪	সম্পত্তির উত্তরাধিকার রীতি	
৫.৫	উত্তরাধিকারযোগ্য পদ ও পদবী	
৫.৬	উত্তরাধিকার প্রশ্নে অগ্রাধিকারভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস	
৫.৭	সম্পত্তির ভাগবন্টন	
৫.৮	অবৈধ সন্তানের উত্তরাধিকার স্বত্ব	

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

	দত্তক	পৃষ্ঠা ৭০
৬.১	দত্তক	
৬.২	সন্তান দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে প্রচলিত সংস্কার ও রীতিনীতির বাধ্যবাধকতা	
৬.৩	তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে সন্তান দত্তক প্রদানে সক্ষম কারা	
৬.৪	তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে সন্তান দত্তক গ্রহণে সক্ষম কারা	
৬.৫	দত্তক সন্তানের সামাজিক মর্যাদা ও আইনগত অধিকার	
৬.৬	সন্তান দত্তক গ্রহণের পর নিঃসন্তান পালক পিতা-মাতার সংসারে সন্তান জন্মগ্রহণ করার ফলাফল	

সপ্তম পরিচ্ছেদ

	স্ত্রীর মর্যাদা	পৃষ্ঠা ৭৩
৭.১	স্ত্রী	
৭.২	স্ত্রীর অধিকার	
৭.৩	বিধবার অধিকার	
৭.৪	বিধবার অধিকার লোপ	

অষ্টম পরিচ্ছেদ

	পিতৃত্ব	পৃষ্ঠা ৭৬
৮.১	পিতৃত্ব	
৮.২	পিতৃত্বের প্রমাণ	
৮.৩	পিতৃত্বের স্বীকৃতি ও ফলাফল	

Scanned with OKEN Scanner

নবম পরিচ্ছেদ

সূচীক্রম নাবালকের অভিভাবকত্ব পৃষ্ঠা ৭৮

৯.১ নাবালকের সংজ্ঞা
৯.২ নাবালকের অভিভাবক
৯.৩ নাবালকের অভিভাবকের শ্রেণী বিভাগ
৯.৪ অভিভাবক দাবীদারগণের অগ্রাধিকারভিত্তিক ক্রমবিন্যাস
৯.৫ নাবালকের দেহের অভিভাবকত্বের দাবীর অগ্রাধিকারের ক্রম
৯.৬ নাবালকের অভিভাবক হিসেবে সরকার
৯.৭ অভিভাবকের দায়-দায়িত্ব, বিশ্বাসের সম্পর্ক
৯.৮ অভিভাবকের ক্ষমতার পরিসমাপ্তি

দশম পরিচ্ছেদ

দান পৃষ্ঠা ৮১

১০.১ দানের সংজ্ঞা
১০.১.১ দানের অপরিহার্য শর্তাবলী/বৈশিষ্ট্যসমূহ
১০.১.২ হস্তান্তর
১০.১.৩ বিদ্যমান সম্পত্তি
১০.১.৪ স্বেচ্ছায় দান
১০.১.৫ প্রতিদান/মূল্যবিহীন
১০.১.৬ কে কে দান গ্রহণ করতে পারে
১০.১.৭ দান কখন গ্রহণ করতে হবে
১০.১.৮ দান গ্রহীতা হিসেবে স্ত্রী ও কন্যা সন্তান
১০.১.৯ দান কখন স্থগিত বা প্রত্যাহার করা যায়
১০.১.১০ দাতার যোগ্যতা
১০.১.১১ সমুদয় সম্পত্তি দান করা যায় না
১০.১.১২ দানের প্রমাণ
১০.১.১৩ ব্যাখ্যা
১০.২ দান পদ্ধতি
১০.২.১ মৌখিক দান
১০.২.২ দান কবলা সম্পাদন
১০.৩ দানের পরিণতি

Scanned with OKEN Scanner

একাদশ পরিচ্ছেদ
ভরন-পোষণ

সূচীক্রম পৃষ্ঠা ৮৫

১১.১ ভরন-পোষণ
১১.২ ব্যাখ্যা
১১.৩ ভরন-পোষণ বা প্রতিপালন বিধি
১১.৩.১ ভরন-পোষণ দাতার সামর্থ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ
১১.৩.২ ভরন-পোষণের যুক্তিসম্মত দাবী
১১.৪ অখন্ডনীয় বা নিরঙ্কুশ দায়িত্ব
১১.৫ সীমিত বা সম্পত্তি ও শর্ত নির্ভর দায়িত্ব
১১.৬ নিরঙ্কুশ দায়িত্ব
১১.৭ শর্ত নির্ভর দায়িত্ব
১১.৮ ভরন-পোষণের দায়িত্ব পালন ও দায়িত্ব বরখেলাপের ফলাফল

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
উইল

পৃষ্ঠা ৮৯

১২.১ উইলের সংজ্ঞা
১২.২ বাংলাদেশের উইল কিভাবে তৈরী/প্রস্তুত করা হয়
১২.৩ তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের উইল ও উইল সংক্রান্ত নীতিমালা
১২.৪ মন্তব্য
১২.৫ মন্তব্য
১২.৬ উত্তরাধিকারযোগ্য পদ উইলযোগ্য নয়
১২.৭ উইল তামাদি
১২.৮ আদালতের ঘোষণা দ্বারা জাল/মিথ্যা উইল বাতিলযোগ্য
১২.৯ উইলের ফলাফল

Scanned with OKEN Scanner

একাদশ পরিচ্ছেদ
ভরন-পোষণ

সূচীক্রম

পৃষ্ঠা ৮৫

১১.১ ভরন-পোষণ
১১.২ ব্যাখ্যা
১১.৩ ভরন-পোষণ বা প্রতিপালন বিধি
১১.৩.১ ভরন-পোষণ দাতার সামর্থ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ
১১.৩.২ ভরন-পোষণের যুক্তিসম্মত দাবী
১১.৪ অখন্ডনীয় বা নিরঙ্কুশ দায়িত্ব
১১.৫ সীমিত বা সম্পত্তি ও শর্ত নির্ভর দায়িত্ব
১১.৬ নিরঙ্কুশ দায়িত্ব
১১.৭ শর্ত নির্ভর দায়িত্ব
১১.৮ ভরন-পোষণের দায়িত্ব পালন ও দায়িত্ব বরখেলাপের ফলাফল

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
উইল

পৃষ্ঠা ৮৯

১২.১ উইলের সংজ্ঞা
১২.২ বাংলাদেশের উইল কিভাবে তৈরী/প্রস্তুত করা হয়
১২.৩ তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের উইল ও উইল সংক্রান্ত নীতিমালা
১২.৪ মন্তব্য
১২.৫ মন্তব্য
১২.৬ উত্তরাধিকারযোগ্য পদ উইলযোগ্য নয়
১২.৭ উইল তামাদি
১২.৮ আদালতের ঘোষণা দ্বারা জাল/মিথ্যা উইল বাতিলযোগ্য
১২.৯ উইলের ফলাফল

Scanned with OKEN Scanner

প্রথম পরিচ্ছেদ

পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন ও বিচার ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ

১.১ **পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন ও বিচার ব্যবস্থার ক্রমবিকাশঃ** ১৮৬০[১] সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামের আলাদা একটি জেলা সৃষ্টি হওয়ার আগ পর্যন্ত বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি চট্টগ্রাম জেলারই একটি অংশ ছিল। ১৮৬০ সনে রাঙ্গামাটির চন্দ্রঘোনা নামক স্থানে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রথম প্রশাসনিক সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ১৮৬৮ সনে তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার সদর দপ্তর চন্দ্রঘোনা হতে রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তর হয়।

১৮৮৪ সনের আঞ্চলিক সার্কেল বিধির আওতায় (Rules for Territorial Circles in the Chittagong Hill Tracts, 1884)[২] তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে (১) রাজা হরিশ্চন্দ্রের (চাকমা) সার্কেল, (২) মং রাজার সার্কেল, (৩) বোমাং রাজার সার্কেল, (৪) সদর সাব ডিভিশনাল খাসমহাল ও (৫) সাঙ্গু সাব ডিভিশনাল খাসমহাল নামে মোট ৫টি সার্কেলে ভাগ করা হয়। উল্লিখিত আঞ্চলিক সার্কেল বিধি দ্বারা তিন রাজার তিনটি সার্কেলের (রাজ্য) সীমানা নির্ধারণ করে দেয়া হয়।

১৮৮৪ সনের আঞ্চলিক সার্কেল বিধি সংশোধন ও পরিবর্তন করে ১৮৯২[৩] সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার পূর্বের তিনজন চীফের তিনটি সার্কেল বহাল রেখে সরকারী সংরক্ষিত বনাঞ্চল নামে একটি নতুন সার্কেল গঠন করে মোট ৪টি সার্কেল করা হয়। জেলার শাসন কাজ পরিচালনার জন্য মোট ১৭টি বিধি সম্বলিত "Rules for the Administration of the Chittagong Hill Tracts" নামে একটি বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। উক্ত বিধিমালার ৩নং বিধি দ্বারা সমগ্র জেলাকে মোট ৩৩টি ব্লক বা তালুকে বিভক্ত করা হয়। ৪নং বিধি দ্বারা ১$\frac{১}{২}$ বর্গমাইল থেকে ২০ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে এক একটি মৌজা গঠন করার ব্যবস্থা করা হয়। ৫নং বিধিতে প্রত্যেক তালুকে একজন দেওয়ান নিয়োগ ও তালুকসমূহকে মৌজায় বিভক্ত করে মৌজা হেডম্যান নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। বিধিমালার ৭নং বিধিতে তালুক দেওয়ান ও মৌজা হেডম্যানগণের প্রশাসনিক ক্ষমতা নির্ধারণ করে দেয়া হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনকে যুগোপযোগী ও গতিশীল করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ১৯০০ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন (Regulation 1 of 1900)[৪] নামের একটি আইন জারী করেন। উক্ত রেগুলেশনের ১৮নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার একই বছরে ১৮৯২ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি Rules for the Administration of the Chittagong Hill Tracts[৫] সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে একই শিরোণামে একটি বিধিমালা প্রণয়ন করেন, যা স্থানীয়ভাবে Hill Tracts Manual[৬]

Scanned with OKEN Scanner

নামে পরিচিত। উল্লিখিত বিধিমালায় সার্কেল চীফ ও মৌজা হেডম্যানকে আদিবাসীদের সামাজিক বিরোধ নিষ্পত্তির কিছু বিচারিক ক্ষমতা দেয়া হয়।

আদিবাসী সমাজের সার্কেল চীফ/রাজা ও হেডম্যানদের প্রশাসনিক ও বিচারিক ক্ষমতার উৎস মূলতঃ তাদের সমাজে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি ও প্রথাসমূহ, যা পরবর্তীতে আইনী স্বীকৃতি অর্জন করে। Francis Buchanan, এর Francis Buchanan in South-Eastern Bengal[৭] গ্রন্থ সূত্র অনুসারে বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী সব আদিবাসীর মধ্যে তৎকালে গ্রাম হেডম্যান প্রথা/ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তিনি ২১শে মার্চ, ১৭৯৮ সনে চট্টগ্রাম থেকে যাত্রা করে ৭ই এপ্রিল নাগাদ রামু পৌঁছেছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ পথের পূর্ব দিকে অবস্থিত পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন আদিবাসীর নাম ও বিবরণ পেয়েছিলেন। চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল থেকে ফেরার পথে চট্টগ্রামের পূর্ব দিকের পাহাড়ে বসবাসকারী বিভিন্ন আদিম অধিবাসী যথাঃ- মারমা, লাঙ্গাঁ/কুঙ্গি, সাক, ম্রং/টিপেরা বনযুগী ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর সর্দার/নেতা, বা রুয়া-সাদের (গ্রাম প্রধান) সাথে তিনি দেখা করে প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর ইতিহাস, ধর্ম বিশ্বাস ও তাদের জীবনধারা জেনে নেন। সর্বশেষ তিনি বর্তমান বোমাং রাজার পূর্ব পুরুষ মারমাদের প্রধান কং হ্লা প্রু- এর সাথে সুয়ালক নামক স্থানে দেখা করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকেই উপরোক্ত বিভিন্ন আদিবাসী নেতাদের রুয়া-সা (গ্রাম প্রধান) নামক পদবীর কথা সর্বপ্রথম জানা যায়।

ফ্রান্সিস বুকানন তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থে রুয়া-সা (Rua-sa) বলতে মারমাদের স্থানীয় প্রধান/চীফ, যার বর্মী নাম য়্য-সা, আরাকানী নাম য়্যসা এবং বাংলায় বিকৃত শব্দ রোয়াজা বলে উল্লেখ করেন।

ডঃ সুনীতি ভূষণ কানুনগো তাঁর A History of Chittagong, Volume 1[৮] গ্রন্থে তৎকালীন চট্টগ্রাম জেলার পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত আরাকানী প্রশাসনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদবীর নাম উল্লেখ করেন। রোয়াজা এবং কার্বারী সে সব পদবীর অন্যতম। তাঁর মতে, রোয়াজা পদবীটা আরাকানী আর 'কার্বারী' পার্শি শব্দ।

নতুন সৃষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার সুপারিনটেন্ডেন্ট ক্যাপ্টেন জে.এম. গ্রাহামের ১৮ই নভেম্বর, ১৮৬২ তারিখের এক পত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামে রোয়াজা বা গ্রাম প্রধানের অস্তিত্বের কথা সর্বপ্রথম উঠে আসে। তিনি লিখেছেন, As often happens not even the `Roaja of a village is to be found, and then the only course is to apply to the head zeminder such as the Poang Raja, or Kalindi Rani to produce the person wanted while they having a thorough knowledge of their ryots and a hold over them, have no difficulty in doing.

Scanned with OKEN Scanner

১৮ই অক্টোবর, ১৮৬৭ তারিখের Report on the Capitation tax revenue settlement of the Chittagong Hill Tracts[৯] শিরোণামের ক্যাপ্টেন টি.এইচ. লুইনের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, অতীতে রাজা তথা চীফরাই আদিবাসীদের গ্রাম প্রধান নিযুক্ত করতেন। টি.এইচ. লুইন তাঁর সেই প্রতিবেদনের সাথে রাজা বা চীফকে প্রদানের জন্য সনদ ও গ্রাম হেডম্যান নিয়োগ পত্রের দু'টো আলাদা-আলাদা নমূনাও সংযুক্ত করেছিলেন।

ক্যাপ্টেন লুইন তাঁর উল্লিখিত প্রতিবেদনে লিখেছেন, "Formerly the head of a village (or what we miscall a Talookder) was appointed by the Chief being generally the most able man of the village was set forward by his village fellows to be their mouthpiece and through whom they paid their tribute."

"This was what was formerly the custom"[১০].

ক্যাপ্টেন লুইনের উত্থাপিত সনদপত্র ও গ্রাম হেডম্যান নিয়োগ প্রস্তাবটি তাৎক্ষণিকভাবে গৃহীত না হলেও ১৮৯২ ও ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধিতে (Rules for the Administration of the Chittagong Hill Tracts) সার্কেল চীফ ও মৌজা হেডম্যানগণকে যে ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদান করা হয় তা মূলতঃ আদিবাসী প্রধানগণের জন্য প্রস্তাবিত সেই সনদ ও গ্রাম হেডম্যান নিয়োগ পত্রে সন্নিবেশিত ক্ষমতা ও দায়িত্বসমূহেরই প্রতিফলন। ক্যাপ্টেন লুইন তাঁর প্রস্তাবিত সনদ ও হেডম্যান নিয়োগ পত্রে (Selections from the correspondence on the Revenue Administration of the Chittagong Hill Tracts 1862-1927)[১১] চীফ ও গ্রাম হেডম্যানদের ওপর নতুন কোনো দায়িত্ব এবং ক্ষমতা প্রদানের সুপারিশ করেননি। তিনি আদিবাসী সমাজের প্রধান এবং গ্রাম হেডম্যানদের ক্ষয়িষ্ণু ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে পূনঃপ্রতিষ্ঠাক্রমে অত্রাঅঞ্চলের আদিবাসী সমাজে ও স্থানীয় প্রশাসনে তাদের ভূমিকা ও অবস্থানের আইনী সমর্থন এবং বৈধতা দিতে চেয়েছেন মাত্র।

১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন (Regulation 1 of 1900)[১২] ও উক্ত রেগুলেশনের ১৮নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৮৯২ সনের Rules for the Administration of the Chittagong Hill Tracts এর সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন দ্বারা একই শিরোণামে প্রণীত বিধিমালায় সার্কেল চীফ ও মৌজা হেডম্যানকে প্রদত্ত দায়িত্ব ও বিচারিক ক্ষমতা আইনের মাধ্যমে নির্ধারণ করে দেয়া হয়।

১.২ <u>সার্কেল চীফ/রাজা নিয়োগ/অভিষেকঃ</u> ১৮৬০ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামের আলাদা একটি জেলা সৃষ্টি করার সময়ে একজন চাকমা চীফ এবং (পোয়াং রাজা নামে ঐতিহাসিক দলিলাদিতে পরিচিত) একজন বোমাং চীফ তখন এ অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলে বসবাসকারী ত্রিপুরা, মারমা এবং চাকমাদের নেতৃত্বে ছিলেন ক্যজা সাইন নামের

Scanned with OKEN Scanner

একজন মারমা জমিদার (Settlement Holder)। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তৎকালীন অবিভক্ত চট্টগ্রাম জেলার পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীদের নেতৃত্বদানকারী ও জমিদার (Settlement Holder/কার্পাস মহাল) হিসেবে চাকমা রাজা ও বোমাং রাজা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সৃষ্টি হবার সময় মং চীফ বলে কেউই ছিলেন না। জুম খাজনা (রাজস্ব) আদায় ও প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ১৮৬২-৬৩ সনে এই দুই রাজার পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলের জমিদার (Settlement Holder) ক্যজা সাইনকে মং রাজা বা মং চীফ হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

কালিন্দী রাণী এবং বোমাং রাজা যথাক্রমে চাকমা ও মারমা জনগোষ্ঠী প্রধান হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সৃষ্টি হবার অনেক আগে থেকেই চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে নিজ নিজ এলাকার আদিবাসীদের প্রধান হিসেবে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তারা বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে একাধারে রাজা এবং জমিদার (কার্পাস মহালের মালিক) হিসেবে পরিচিত। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম নামের নতুন জেলা সৃষ্টি হবার পরও রাজা হিসেবে তাদের নতুনভাবে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতির প্রয়োজন হয়নি। একমাত্র ক্যজা সাইনকেই উত্তরাঞ্চলের মারমা, ত্রিপুরা ও চাকমাদের প্রধান/রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেবার প্রয়োজন হয়। ১৮৬২ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত তৎকালীন বাংলা সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনার ও চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারের মধ্যে দীর্ঘ ২০ বছর যাবত পত্র বিনিময়, বিভিন্ন পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শের পরই ১৮৮৪ সনের আঞ্চলিক সার্কেল বিধি (Rules for Territorial Circles in the Chittagong Hill Tracts) গৃহীত হয় ও সেই বিধি অনুযায়ী ১৮৮৪ সনে তিন রাজা/চীফের শাসনাধীন এলাকাসমূহকে তিনটি আলাদা-আলাদা সার্কেলে ভাগ করা হয়। তখন থেকেই তিনজন রাজা সার্কেল চীফ হিসেবে পরিচিত হন[১৩]।

১.৩ <u>রাজ প্রথাঃ</u> বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে আদিবাসী প্রধান, সার্কেল চীফ ইত্যাদি নামে পরিচিত হলেও নিজ নিজ শাসনাধীন এলাকার অধিবাসীদের কাছে তাঁরা রাজা হিসেবে পরিচিত। সার্কেল চীফ হিসেবে তাঁরা ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধিমতে প্রশাসনিক ও বিচারিক ক্ষমতারও অধিকারী। এ সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হলোঃ-

১.৪ <u>রাজাঃ</u> রাজা পদটি উত্তরাধিকারযোগ্য একটি পদ। চাকমা ও মং সার্কেল চীফ পদের ক্ষেত্রে রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং রাজার একাধিক স্ত্রীর বেলায় প্রথম স্ত্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্র (সামাজিক ও বৈধ বিবাহ দ্বারা জন্মগ্রহণকারী সন্তান) রাজপদ লাভ করেন। রাজার ঔরসজাত কোনো পুত্র সন্তান না থাকলে, সেক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ কন্যার পুত্র রাজা হবেন। মং সার্কেল চীফের ঔরসজাত পুত্র-কন্যার অবর্তমানে দত্তক পুত্র-কন্যা রাজপদের উত্তরাধিকারী হয় না। সেক্ষেত্রে মং সার্কেল চীফের ঔরসজাত পুত্র-কন্যার অবর্তমানে তাঁর স্ত্রী (রাণী) অতঃপর রাজার পৈত্রিক সূত্রের রক্ত সম্পর্কীয় কোনো যোগ্য ব্যক্তি প্রচলিত রীতি ও সমাজ স্বীকৃত প্রথা অনুসারে মং সার্কেল চীফ পদে অধিষ্ঠিত হবেন। বোমাং সার্কেলের প্রচলিত রীতি ও সমাজ স্বীকৃত প্রথা অনুযায়ী বোমাং রাজ পরিবারের

Scanned with OKEN Scanner

পিতৃ/মাতৃকুলে যিনি সর্ব বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তিনি বোমাং সার্কেল চীফ হবেন। যদি সর্ব বয়োজ্যেষ্ঠ সেই ব্যক্তি বোমাং সার্কেলের চীফ পদ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন না করেন, সেক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বোমাং সার্কেলের মারমা সমাজে প্রচলিত নীতি ও সমাজ স্বীকৃত সার্কেল চীফ নিয়োগ পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁকে সার্কেল চীফ পদে নিয়োগ দান করবেন।

১.৫ **রাজ্যাভিষেক/রাজপদে অভিষিক্তকরণঃ** ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৪৮নং বিধিতে সার্কেল চীফগণকে রাজপদে অভিষিক্ত করার ক্ষমতা সরকারকে দেয়া হয়েছে।

ভাষ্যঃ রাজার মৃত্যু বা অন্য কোনো কারণে রাজপদ শুন্য হলে চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার সরকারের পক্ষে নতুন রাজাকে তরবারি উপহার দিয়ে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। অভিষেকের মাধ্যমে রাজপদে অধিষ্ঠিত হবার পর রাজার জীবনাবসান ব্যতীত অন্য কোনোভাবে রাজাকে অপসারণের কোনো আইনগত সুযোগ পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধিতে নেই।

১.৬ **১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির আওতায় রাজার ক্ষমতা ও কার্যাবলীঃ**

ক) সার্কেল চীফ বা রাজা তাঁর সার্কেলের প্রধান। সার্কেল প্রধান হিসেবে তিনি জেলার ডেপুটি কমিশনারের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন (বিধি নং- ৩৮)।

খ) সার্কেল চীফ হিসেবে তিনি ডেপুটি কমিশনারের পরে সাব-কালেক্টর বা সরকারের খাজনা আদায়কারী (বিধি নং- ৪৩)।

গ) সার্কেল চীফ জেলার প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে ডেপুটি কমিশনারকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তিনি একটি উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন করেন এবং কাউন্সিলের সুপারিশ অনুসারে তিনি ডেপুটি কমিশনারকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন (বিধি নং- ৩৯)।

ঘ) তিনি মৌজা হেডম্যান নিয়োগ ও অপসারণে ডেপুটি কমিশনারকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন, যদিও ডেপুটি কমিশনার তাঁর পরামর্শ মেনে নিতে বাধ্য নন। তবে তাঁর পরামর্শ সর্বোচ্চ বিবেচনার দাবী রাখে (বিধি নং- ৪৮)।

ঙ) মৌজা হেডম্যানগণ কর্তৃক খাজনা আদায় ও এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখাসহ অপরাধ দমনে তাদের প্রতি আদেশ, নির্দেশ ও পরামর্শ প্রদান তাঁর দায়িত্বের আওতাধীন (বিধি নং- ৩৮)।

চ) মৌজা হেডম্যান কর্তৃক আদায়কৃত খাজনা সরকারী কোষাগারে জমাদান নিশ্চিত করা তাঁর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব (বিধি নং- ৩৮)।

ছ) এলাকার জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করাও তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব (বিধি নং- ৩৮)।

জ) তিনি নিজ সার্কেলের অধীন মৌজাসমূহে ডেপুটি কমিশনারের আদেশ নির্দেশ কার্যকরীকরণ নিশ্চিত করে থাকেন (বিধি নং- ৩৮)।

Scanned with OKEN Scanner

ঝ) ডেপুটি কমিশনারের আদালতে বিচারাধীন মামলায় প্রথাগত আইন ও সামাজিক রীতিনীতির কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজনে ডেপুটি কমিশনার সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফ/রাজার নিকট মতামত আহবান করলে তিনি তাঁর ব্যাখ্যা ও মতামত দিয়ে থাকেন (বিধি নং-৪০)।

১.৭ **তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত ক্ষমতাঃ** ১৯৮৯ সনের পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১নং আইন) প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফ পরিষদের যে কোনো সভায় যোগদান ও সভার আলোচ্য বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন (ধারা নং- ২৬)[১৪]।

মৌজা গঠন/সৃষ্টি ও হেডম্যান নিয়োগ প্রথা

১.৮ **মৌজা গঠন ও হেডম্যান পদঃ** ১৮৯২ সনের[১৫] পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৪নং বিধিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩৩টি তালুককে ১ $\frac{১}{২}$ থেকে ২০ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে মৌজায় বিভক্ত করার ব্যবস্থা রাখা হয়। এই বিধি মোতাবেক মৌজা ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির (হিল ট্রাক্টস্ ম্যানুয়েল) ৩৭নং বিধিতে তিনজন রাজার ৩টি সার্কেলকে মৌজায় বিভক্ত করার পুনঃ বিধান করা হয়। সেই একই বিধিতে প্রত্যেক মৌজায় একজন করে মৌজা হেডম্যান নিয়োগের বিধান রাখা হয়। তিন পার্বত্য জেলার তিনটি সার্কেল বর্তমানে ৩৯০টি মৌজায় বিভক্ত।

১.৯ **হেডম্যান নিয়োগ পদ্ধতিঃ** পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৪৮নং বিধিমতে সার্কেল চীফের (রাজা) সাথে পরামর্শ করে ডেপুটি কমিশনার মৌজা হেডম্যান নিয়োগ করবেন, যদিও পরামর্শ গ্রহণ এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নয়। তবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে তার পরামর্শ বিবেচনার দাবী রাখে। হেডম্যান পদটি বংশানুক্রমিক নয়। তবে হেডম্যানের উপযুক্ত পুত্র হেডম্যান পদে নিয়োগ লাভের বেলায় অগ্রাধিকারের দাবী রাখেন।

১.১০ **হেডম্যানের ক্ষমতা ও কার্যাবলী**

ক) ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৩৮নং বিধিতে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মৌজা হেডম্যান নিষ্ঠার সাথে তাঁর মৌজার জন্য নির্ধারিত খাজনা আদায় করবেন এবং মৌজার বকেয়া খাজনার হিসাব রাখবেন। তিনি ডেপুটি কমিশনার, মহকুমা প্রশাসক (বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার) এবং সার্কেল চীফ/রাজার আদেশ মেনে চলবেন। তিনি তাঁর মৌজায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন এবং মৌজায় চাষাবাদে আয়তনের কোনো পরিবর্তন ঘটলে তৎসম্পর্কে ডেপুটি কমিশনারকে অবহিত করবেন।

খ) ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৪১নং বিধিমতে হেডম্যান তাঁর মৌজায় জুম চাষ নিয়ন্ত্রণ করবেন। ৪২নং বিধিমতে তাঁর মৌজায় বসবাসকারী জুমিয়া তথা জুম চাষীদের কাছ থেকে জুম খাজনা আদায় করবেন। তিনি পরিবার প্রধানের নাম ও সদস্য সংখ্যা, খাজনা পরিশোধকারী কিংবা খাজনা পরিশোধে অব্যাহতি প্রাপ্ত

Scanned with OKEN Scanner

নতুন বা পুরাতন পরিবার ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত একটা জুম তৌজি (জুমিয়া তথা জুম চাষীর তালিকা) প্রস্তুত করে প্রত্যেক বছর ১লা জুনের আগে সার্কেল চীফ তথা রাজার কাছে দাখিল করবেন, যা ১লা আগষ্টের আগে ডেপুটি কমিশনারের কাছে রাজাকে দাখিল করতে হবে। হেডম্যানের (খাজনার) দাবীর অন্ততঃ ৫০% রাজপূণ্যাহ'র দিন এবং অবশিষ্ট অংশ পরবর্তী বছরের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে রাজার কাছে পরিশোধ করবেন। হেডম্যান যদি মনে করেন যে, কোনো প্রজা জুম খাজনা প্রদান থেকে রেহাই পাবার জন্য অন্যত্র পালিয়ে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাহলে তিনি সেই প্রজার সম্পত্তি আটক করতে পারবেন এবং বিষয়টি সার্কেল চীফ ও ডেপুটি কমিশনারকে জানাবেন। যদি কোনো হেডম্যান অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণে অবহেলা করেন, তাহলে সেই প্রজার অনাদায়ী খাজনার জন্য তিনি দায়ী হবেন। ৪৩ বিধিমতে হেডম্যান তাঁর সংশ্লিষ্ট মৌজার রাজস্ব আদায় করবেন। ৪৫ বিধিমতে তিনি ঘাস (শন্‌খোলা) ও গর্জনখোলার খাজনা এবং ৪৫(বি) বিধিমতে গোচারণ ভূমির ট্যাক্স আদায় করবেন।

১.১১ <u>মৌজার প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্বঃ</u> পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৪১(এ)নং বিধির বিধানমতে মৌজা হেডম্যান তাঁর মৌজার প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে দায়বদ্ধ। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নিবেনঃ-

ক) কোনো মৌজাবাসীকে গৃহাস্থলী কাজ ব্যতীত অন্য কোনো কাজে মৌজার বনজ সম্পদ, যথাঃ- বাঁশ, কাঠ, বেত ইত্যাদি অন্য কোনো মৌজায় অপসারণ এবং অনিবাসী ব্যক্তির দ্বারা অনুরূপ কোনো কিছু অপসারণের কাজে তিনি নিষেধাজ্ঞা জারী করতে পারবেন।

খ) মৌজাস্থ কোনো এলাকা/এলাকা বিশেষের বনজ সম্পদ সংরক্ষণের নিমিত্তে ঐ এলাকাকে জুম চাষের আওতামুক্ত ঘোষণা করতে পারবেন।

গ) যদি হেডম্যানের বিবেচনায় নবাগত কেউ তাঁর মৌজায় জুম চাষ করলে পরবর্তী বছর মৌজাবাসীর জুম চাষে জমির সংকট দেখা দেবে এমন মনে হয়, তাহলে তিনি তাঁর মৌজায় নবাগতদের জুম চাষ নিষিদ্ধ করে দিতে পারবেন।

ঘ) জুম চাষের জন্য ক্ষতিকর প্রতীয়মান হলে হেডম্যান তাঁর মৌজায় গোচারণ নিষিদ্ধ করে দিতে পারবেন।

১.১২ <u>বসত বাড়ীর জন্য খাস জমি বন্দোবস্তী/দখলে রাখার অনুমতি প্রদানের ক্ষমতাঃ</u> জেলা প্রশাসকের আনুষ্ঠানিক বন্দোবস্তী ব্যতিরেকে পৌর এলাকা বহির্ভূত মৌজায় মৌজা হেডম্যান তাঁর মৌজার কোনো পাহাড়ী বাসিন্দাকে বসতবাড়ী নির্মাণের জন্য সর্বোচ্চ ০.৩০ একর জমি ভোগ দখলে রাখার অনুমতি দিতে পারেন। তবে এসব বসতবাড়ীর দখলভূক্ত জমির হিসেব রাখার জন্য তাকে একটি আলাদা রেজিষ্টার তৈরী করে রাখতে হবে (বিধি নং- ৫০(১)।

Scanned with OKEN Scanner

১.১৩ <u>ভূমিঃ</u> সরকারী ভূমি বন্দোবস্ত, হস্তান্তর, ভাগ-বন্টন এবং সাবলেট প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মৌজা হেডম্যানের সুপারিশ প্রদানের ক্ষমতা (৩৪(১)(ii) বিধি)।

১.১৪ <u>হেডম্যান অপসারণঃ</u> পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৪৮নং বিধিতে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ডেপুটি কমিশনার যে কোনো মৌজা হেডম্যানকে অযোগ্যতা ও অসদাচরণের দায়ে সার্কেল চীফকে জানিয়ে হেডম্যান পদ থেকে অপসারণ করতে পারবেন।

১.১৫ <u>সার্কেল চীফ ও হেডম্যানের বিচারিক ক্ষমতা</u>

১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৪০ বিধিতে ব্যতিক্রমী কিছু উল্লেখ না থাকলে, মৌজা হেডম্যানগণ সংশ্লিষ্ট মৌজার অধিবাসী কর্তৃক আনীত বিরোধীয় সকল বিষয়ের উপর বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। তারা সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের প্রচলিত সামাজিক রীতি অনুসারে মোকাদ্দমাসমূহের বিচার করবেন। এ ধরণের বিচারে হেডম্যান সর্বোচ্চ ২৫ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারবেন এবং অন্যায়ভাবে সংগৃহীত বা চোরাই মালামাল ফেরত প্রদানে বাধ্য করতে পারবেন। তা ছাড়া এতদবিষয়ে জেলা প্রশাসকের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত দোষী ব্যক্তিকে আটক রাখবার আদেশ দিতে পারবেন।

এই বিধিতে ভিন্ন কিছু বর্ণিত না থাকলে সার্কেল চীফগণ, খাস মৌজার হেডম্যান হিসেবে তাদের নিকট মীমাংসার জন্য উপস্থাপিত বিরোধীয় সকল বিষয়ের উপর বিচার পূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারবেন। অনুরূপ বিরোধসমূহ, যা হেডম্যানদের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রেরিত বা হেডম্যানগণ নিজেরাই দাখিল করেছেন সেই বিরোধগুলোও সার্কেল চীফগণ একইভাবে বিচার নিষ্পত্তি করবেন।

সার্কেল চীফ ৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারবেন এবং অবৈধভাবে লব্ধ কোনো কিছু ফেরত প্রদানে বাধ্য করতে পারবেন। এছাড়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর জেলা প্রশাসকের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত দোষী ব্যক্তিকে আটক রাখবার আদেশ দিতে পারবেন। মামলার রায়সমূহের রিভিশন পর্যায়ে সাধারণ অধিক্ষেত্র হিসেবে জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। সার্কেল চীফ অথবা হেডম্যান কর্তৃক প্রদত্ত কোনো মামলার রায়ে আরোপিত শাস্তি তারা কার্যকর করতে ব্যর্থ হলে আরোপিত শাস্তি কার্যকর করবার জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন করতে পারবেন।

সার্কেল চীফ অথবা হেডম্যানগণ কর্তৃক বিচার্য মোকদ্দমায় কোন কোর্ট ফি প্রদান করতে হবে না। এরূপ মামলায় আরোপিত জরিমানা সংক্ষুব্ধদের মাঝে (যদি থাকে) এবং সামাজিক প্রথা অনুসারে সমষ্টিগতভাবে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। সামাজিক রীতিসিদ্ধ হলে সমষ্টিগতভাবে বাটোয়ারাকৃত অনুরূপ জরিমানার সমপরিমাণ অংশ সার্কেল চীফ এবং হেডম্যানও পাবার অধিকারী। কিন্তু যেভাবেই

Scanned with OKEN Scanner

হোক না কেন, কোনো নজরানা বা বিচার সম্পর্কিত বিষয়ের জন্য প্রয়োজন এই অজুহাতে অন্য কোনো কিছু আরোপ করা যাবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, সার্কেল চীফ অথবা মৌজা হেডম্যানগণ জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে বিচার সম্পর্কিত ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ফিস আদায় করতে পারবেন।

◆ **মন্তব্যঃ** সার্কেল চীফ ও মৌজা হেডম্যানগণ কর্তৃক আদিবাসীদের সামাজিক বিরোধ নিষ্পত্তির এই ক্ষমতা তৎকালীন জেলা প্রশাসক এস.জেড. খানের স্মারক নং-১২৪৩(৪০০)/সি, রাঙ্গামাটি, তারিখঃ ৫ মে ১৯৬৪ মূলে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনে স্বীকার করা হয়েছে।

সময়ে সময়ে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হলে সার্কেল চীফ অথবা হেডম্যানগণ নিম্নের আলোচ্য বিধি মোতাবেক তাদের নিকট বিচারের নিমিত্তে উপস্থাপিত মামলা ব্যতীত অন্য কোনো ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলার বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হবেন না।

এই বিধি অনুযায়ী সার্কেল চীফ এবং হেডম্যানগণের সকল রায়ের উপর সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের রিভিশনাল ক্ষমতা এবং সমন্বিত অধিক্ষেত্র থাকবে।

নিম্নে নির্দিষ্টকৃত অপরাধসমূহ অত্র বিধিমতে সার্কেল চীফ ও হেডম্যানের বিচার ক্ষমতা বহির্ভূত। যথাঃ-

(ক) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অধীনে কর্মরত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ অথবা গণনীতির বিরুদ্ধে অপরাধ।

(খ) মারণাস্ত্রসহ সংঘটিত দাঙ্গা অথবা গুরুতর আঘাতের কারণ হতে পারে এমন দাঙ্গা।

(গ) ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংঘটিত নিম্নেবর্ণিত অপরাধ যথাঃ- খুন, অপরাধমূলক নরহত্যা, ইচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত, অবৈধ অবরোধ, ধর্ষণ, অপহরণ, মনুষ্যহরণ এবং অস্বাভাবিক অপরাধসমূহ।

(ঘ) বলপূর্বক সম্পত্তি গ্রহণ, দস্যুতা, ডাকাতি, অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ, গৃহে অনধিকার প্রবেশ, অপথে গৃহে প্রবেশ (যখন ৫০ টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তি জড়িত থাকে)।

(ঙ) জালিয়াতি।

(চ) ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনের ৪র্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত ১১ ধারা (আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ দখলে থাকা এবং গান পাউডার প্রস্তুত করা), ১২ ধারা (দা, বল্লম, তীর, ধনুক ইত্যাদি জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পর দখলে রাখা), ১৩ ধারা (বিষাক্ত মাদক দখলে রাখা), ১৪ ধারা (বিদেশী স্পিরিট ও চোলাই মদ জেলা প্রশাসকের প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে দখলে রাখা), ১৫

Scanned with OKEN Scanner

ধারা (স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত স্পিরিট ও চোলাই মদ লাইসেন্স ব্যতিরেকে বিক্রয় করা) ইত্যাদি অপরাধ।

(বর্তমানে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে[১৬] [১৯৯০ সনের ২০নং আইনের ১০(২)(খ) ধারায়] নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হয়েছেঃ রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাসমূহের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগতভাবে প্রস্তুতকৃত মদ উক্ত জেলাসমূহে বসবাসকারী আদিবাসীদের পান করার ক্ষেত্রে এই উপধারার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হবে না)

(ছ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারণ করে দেয়া সে সকল বা সে সকল শ্রেণীর অন্যান্য অপরাধ।

১.১৬ <u>১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন এর সংশোধনী আইন (২০০৩ সনের ৩৮নং আইন) এর ৪(৪) ধারার বিধান নিম্নরূপ</u>[১৭]ঃ-

যুগ্ম জেলা জজ জেলার দেওয়ানী মোকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপারে আদি অধিক্ষেত্র হিসেবে প্রচলিত আইন, প্রথা ও রীতিনীতি অনুসারে বিচার কার্যক্রম সম্পাদন করবেন। তবে আদিবাসীদের মধ্যে উদ্ভূত পারিবারিক ও প্রথাগত আইনের বিষয়ে যুগ্ম জেলা জজের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান ও সার্কেল চীফের বিচারালয়ের মাধ্যমে তা নিষ্পন্ন হবে।

১.১৭ <u>পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১নং আইন)[১৮] ৬৬ ধারায় সার্কেল চীফ বা মৌজা প্রধান কর্তৃক বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধান নিম্নরূপ</u>ঃ-

(ক) সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলায় বসবাসকারী এমন আদিবাসীগণের মধ্যে কোনো সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা পারিবারিক বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয় কার্বারী বা হেডম্যানের নিকট উত্থাপন করতে হবে এবং তিনি সংশ্লিষ্ট আদিবাসীগণের মধ্যে প্রচলিত রীতিনীতি অনুযায়ী বিরোধের নিষ্পত্তি করবেন।

(খ) কার্বারীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হেডম্যান, হেডম্যানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফ এবং সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল করা যাবে এবং কমিশনারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(গ) সার্কেল চীফ বা কমিশনার কোনো আপীল নিষ্পত্তির পূর্বে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী হতে তৎকর্তৃক মনোনীত অনূন্য ৩ জন ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করবেন।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ প্রবিধান দ্বারা এই ধারায় উল্লেখিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য-

ক. বিচার পদ্ধতি

খ. বিচার প্রার্থী ও আপীলকারী কর্তৃক প্রদেয় ফিস নির্ধারণ করতে পারবে।

Scanned with OKEN Scanner

১.১৮ **ব্যাখ্যাঃ** বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে তিন পার্বত্য জেলা রূপে প্রশাসনিকভাবে বিভক্তির পর বর্তমানে আদিবাসী সমাজের জাতীয় প্রধান হলেন বান্দরবান পার্বত্য জেলাতে বোমাং চীফ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাতে মং চীফ এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় চাকমা চীফ। উল্লেখ্য যে, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার রাজস্থলী ও কাপ্তাই উপজেলা বোমাং সার্কেলের অন্তর্ভূক্ত। অনুরূপভাবে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা ও লক্ষ্মীছড়ি উপজেলা চাকমা সার্কেলের অন্তর্ভূক্ত, যে কারণে বোমাং ও চাকমা সার্কেলে চাকমা ও মারমা সমাজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে (জেলার অধিক্ষেত্রের বাইরে হওয়ায়) ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৪০ বিধিমতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে অনেক সময় আদালতের অধিক্ষেত্রের প্রশ্নে আইনী জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়, যদিও সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফ স্ব-স্ব সার্কেলের প্রধান হিসেবে সমাজের সমাজপতি। ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন এর সংশোধনী (২০০৩ সনের ৩৮নং আইন) আইনের ৪(৪) ধারায় আদিবাসীদের মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তিতে পারিবারিক ও প্রথাগত আইনে সংশ্লিষ্ট মৌজা ও সার্কেল চীফকে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে, ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৪০ বিধিমতে সার্কেল চীফের আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশানের অধিক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসককে প্রদান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ৬৬(২) ও ৬৬(৩) ধারামতে চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার এর নিকট আপীল দায়ের ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যার কারণে সামাজিক বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে একাধিক অধিক্ষেত্রের কারণে আইনী দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়েছে, যা ন্যায় বিচারের পথে অন্তরায়।

১.১৯ **কার্বারী আদালতঃ** ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৪৮ বিধিতে কার্বারী নিয়োগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো বিবরণ না থাকলেও পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ৬৬(১) ধারাতে কার্বারী পদের স্বীকৃতি রয়েছে। পার্বত্য জেলাসমূহের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে কোনো প্রকার দ্বন্দ্ব, বিরোধ, সামাজিক সমস্যা, নারীঘটিত কোনো সামাজিক মোকদ্দমার উদ্ভব হলে তা নিষ্পত্তির প্রাথমিক দায়িত্ব কার্বারীর উপর বর্তায়। সচরাচর সংশ্লিষ্ট সার্কেলের রাজা বা চীফ প্রত্যেক মৌজায় মৌজা হেডম্যানের সুপারিশ অনুসারে পাড়া বা গ্রামের জন্য কার্বারী নিয়োগ করে থাকেন। মৌজা হেডম্যানও তাঁর প্রশাসনিক ও সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে মৌজার কিছু কিছু পাড়ায় কার্বারী নিয়োগ করেন, যারা রাজা বা সরকার থেকে ভাতা পান না।

১.২০ **ব্যাখ্যাঃ** মৌজা হেডম্যান সাধারণতঃ গ্রাম্য কার্বারীদের সমন্বয়ে গঠিত সালিশী বোর্ডের মাধ্যমে বিরোধ/মামলা নিষ্পত্তি করে থাকেন। কার্বারী পর্যায়ে বিরোধ নিষ্পন্ন হবার পর সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা পক্ষ হেডম্যান আদালতে শরণাপন্ন হলে মৌজা হেডম্যান সাধারণতঃ গ্রাম্য কার্বারীদের সমন্বয়ে গঠিত সালিশী বোর্ডের মাধ্যমে বিরোধ/মামলা

নিষ্পত্তি করে থাকেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৮৯ সনের পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ৬৬নং ধারায় কার্বারী আদালতের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বর্তমানে কার্বারীগণ সরকার হতে সম্মানী ভাতা পেয়ে থাকেন। কার্বারী আদালতের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি প্রথমে হেডম্যান আদালতে, পরবর্তীতে সার্কেল চীফ আদালতের শরণাপন্ন হয়।

১.২১ উল্লেখযোগ্য সামাজিক বিরোধ ও অপরাধসমূহঃ-

১) একজনের চিহ্নিত জুমে চাষ করা;

২) একজনের জুম হতে জোর পূর্বক ফসল তুলে নেয়া;

৩) একজনের গৃহপালিত পশু-পাখি চুরি করা;

৪) গৃহপালিত পশু-পাখি মালিকের অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে দখল বা হত্যা করা;

৫) সকলের ব্যবহার্য পানির উৎস থেকে পানি প্রবাহ ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা শত্রুতাবশতঃ অসৎ উদ্দেশ্যে বাধা সৃষ্টি বা নষ্ট করা;

৬) অপরের বনজ ও ফলজ বাগানের ক্ষতিসাধন করা;

৭) সর্বসাধারণের চলাচলের পথ দখল বা তা ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা;

৮) ধর্মীয় স্থান ও শ্মশানের পবিত্রতা নষ্ট করা;

৯) কোনো প্রকার অশোভন অঙ্গভঙ্গি, কুৎসিত ইশারা-ইঙ্গিত বা অশালীন শব্দ প্রয়োগের দ্বারা কারো সম্ভ্রম ও সম্মানহানি করা;

১০) নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মত্ত আচরণের দ্বারা কোনো ব্যক্তির, পরিবারের বা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করা;

১১) নিজ পরিবারের পোষ্যদের উপর শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন করা;

১২) পরিবারের বা সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে অসদাচরণ করা;

১৩) দাম্পত্য কলহ দ্বারা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা;

১৪) বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে জনগণের মধ্যে (সমাজে) বিরোধ সৃষ্টি করা;

১৫) বিবাহ বহির্ভূত যৌন মিলনে (ব্যভিচারে) লিপ্ত হওয়া;

১৬) গ্রাম, পাড়া, সমাজ বা পরিবারের শান্তি ও সুস্থিতি নষ্ট করা (Public Nuisance);

১৭) পোষ্যদের ভরন-পোষণ প্রদানে অসম্মত হওয়া/অবহেলা করা;

১৮) সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করা;

১৯) অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব কর্তব্যে অবহেলা করা;

২০) সামাজিক ও পারিবারিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা;

২১) বিনা অনুমতিতে অন্যের গৃহে প্রবেশ করা;

Scanned with OKEN Scanner

২২) চৌর্যবৃত্তি বা অগ্নি সংযোগের দ্বারা কারো সম্পদ হানি করা;

২৩) দুরাচারের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের মর্যাদা ক্ষুন্ন করা;

২৪) নারীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা;

২৫) গৃহকর্তা বা লোকজন না থাকাবস্থায় শুন্য বাড়ীতে প্রবেশ করা;

২৬) স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা, যা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে;

২৭) দত্তক সন্তানের উত্তরাধিকার কিংবা ভরনপোষণ প্রশ্নে পারিবারিক বিরোধ;

২৮) উত্তরাধিকারযোগ্য বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি ভাগবন্টন নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি করা;

২৯) বসতভিটার সীমানা নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি করা বা জোর পূর্বক অন্যের জমি দখল করা;

৩০) পর সম্পদ আত্মসাৎ করা;

৩১) নিষিদ্ধ সম্পর্কের কিংবা ভিন্ন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের পুরুষ বা মহিলার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা;

৩২) ঋণ অথবা দায়-দেনা পরিশোধ না করা;

৩৩) সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন বা অমান্য করা এবং এতদ্ উদ্দেশ্যে অন্যদের উস্কানি দেওয়া;

৩৪) বেপরোয়াভাবে ও নির্বিচারে পশু-পাখি শিকার;

৩৫) মিথ্যার আশ্রয়ে কারোর প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানো, দুর্নাম রটানো বা বিনা কারণে বিরোধ সৃষ্টি করা;

৩৬) কারো ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস কিংবা অনুভূতিতে আঘাত করা;

৩৭) পরকীয়ার মাধ্যমে কারো দাম্পত্য শান্তি নষ্ট করা;

৩৮) আঘাত বা ক্ষতিকর দ্রব্য প্রয়োগ দ্বারা কারো স্বাস্থ্যহানি কিংবা কারো জীবনের ঝুঁকি সৃষ্টি করা;

৩৯) সংস্কৃতি চর্চা ও শিক্ষা গ্রহণের বেলায় বাধা সৃষ্টি করা;

৪০) অপরাধ সংঘটনে কিংবা অনৈতিক কাজে উস্কানি বা উৎসাহ দেওয়া;

৪১) নারী ও শিশুর মনে ভীতি বা আতঙ্ক সৃষ্টি করা;

৪২) কুৎসা রটনার দ্বারা কারো ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে বিপন্ন করা;

৪৩) মাছ কিংবা পশু-পাখি শিকারে বিষটোপ প্রয়োগ করা কিংবা চাষাবাদে বিষাক্ত কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার দ্বারা পরিবেশের ক্ষতিসাধন করা;

৪৪) মৌজার প্রাকৃতিক বনজ সম্পদ বিনষ্ট করা;

Scanned with OKEN Scanner

৪৫) উত্তরাধিকার প্রশ্নে অংশীদারগণের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা/বিরোধে লিপ্ত হতে উস্কে দেওয়া;

৪৬) মামা কর্তৃক ভাগিনার স্ত্রীকে, ভাসুর কর্তৃক ভাইয়ের স্ত্রীকে, শ্বশুর কর্তৃক পুত্রবধুকে মারধর করা এবং স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে মারধর করা;

৪৭) অবৈধ গর্ভধারণ ও গর্ভপাত করা;

৪৮) পতিতাবৃত্তির পেশা গ্রহণ করা;

৪৯) বৈধ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে চোলাই মদ বিক্রি ও পাচার করা;

৫০) কোনো একজনের জাঁক থেকে বিনা অনুমতিতে মাছ ধরা।

পিপিআইআর প্রকল্পের জনগোষ্ঠীভিত্তিক পরামর্শকদের সভা

Scanned with OKEN Scanner

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠী ঃ প্রচলিত রীতিনীতি ও প্রথা

২.১ **তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিতিঃ** পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে চতুর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো তঞ্চঙ্গ্যা। আদিবাসী তঞ্চঙ্গ্যাগণ মূলতঃ মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীভূক্ত। তাদের ভাষা ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীভূক্ত, যার চাকমা ভাষার সাথে উচ্চারণগত সামান্য পার্থক্য থাকলেও অনেকাংশে মিল রয়েছে। রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলায় যথাক্রমে চাকমা সার্কেল ও বোমাং সার্কেলের অধীনে তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর বসবাস।

মূলতঃ (১) জন্মগতভাবে যিনি তঞ্চঙ্গ্যা তথা তঞ্চঙ্গ্যা পরিবারে জন্মগ্রহণকারী (২) পিতা তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর সদস্য (৩) একজন তঞ্চঙ্গ্যা পুরুষের ঔরসজাত ও একজন তঞ্চঙ্গ্যা মহিলার গর্ভজাত ভূমিষ্ট অবৈধ সন্তানও তঞ্চঙ্গ্যা বলে গণ্য হবে।

২.১.১ **ব্যাখ্যাঃ** তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীভূক্ত একজন পুরুষের ঔরসে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিই তঞ্চঙ্গ্যা পরিচয়ের অধিকারী। তঞ্চঙ্গ্যা জাতিসত্বার অন্তর্ভূক্ত কোনো পরিবারে জন্মগ্রহণকারী শিশুর সামাজিক পরিচিতি তঞ্চঙ্গ্যা বলেই স্বীকৃত হবে। তবে মাতাকে তঞ্চঙ্গ্যা নারী হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। নিজেকে তঞ্চঙ্গ্যা হিসেবে পরিচয় দান করে, এরূপ একজন তঞ্চঙ্গ্যার ঔরসে জন্মগ্রহণকারী এবং দত্তক সূত্রে তঞ্চঙ্গ্যা পরিবারে লালিত সন্তানও তঞ্চঙ্গ্যা পরিচয়ে পরিচিতি লাভ করবে।

২.১.২ **গোত্র তালিকাঃ** বর্তমানে বাংলাদেশে বসবাসকারী তঞ্চঙ্গ্যাদের ৭টি গছা গুই্ত্তির নাম পাওয়া যায়। এই ৭টি গছা/গুই্ত্তি (ডেল বা দল) এর পরিচিতি দেয়া গেলোঃ-

	গছা (গোত্র)		গুইত্তি (গোষ্ঠী)
১।	দৈন্যাগছা ডেল বা দল	ঃ	পশোই গুইত্তি, পণ্ডিত গুইত্তি, তাঞ্জব গুইত্তি, কালা থংজা গুইত্তি, বন্ধ্যাব গুইত্তি, পিশো গুইত্তি, রাঙেয়া গুইত্তি, বলা গুইত্তি, বাঙাল্যা গুইত্তি, দান্নোয়া গুইত্তি ও খাত্তল গুইত্তি।
২।	মোগছা ডেল বা দল	ঃ	তাশি গুইত্তি, কবাল্যা গুইত্তি, দাল্লোয়া গুইত্তি, গুণ্যা গুইত্তি ও কুরুগ গুইত্তি, হ্আগারা গুইত্তি ও খুস্যোয়া গুইত্তি।
৩।	কার্‌বয়া গাছা ডেল বা দল	ঃ	গচাল্যা গুইত্তি, ফারাংশা গুইত্তি, বাঙাল্যা গুইত্তি, ল্লাপোস্যা গুইত্তি, আর্‌বয়া গুইত্তি, বক্‌চারা গুইত্তি, তাশি গুইত্তি, বুঙ গুইত্তি ও বলা গুইত্তি।

Scanned with OKEN Scanner

গছা (গোত্র)		গুইত্তি (গোষ্ঠী)
৪। মংলা গছা ডেল বা দল	ঃ	পালংশা গুইত্তি, দারন্যা গুইত্তি, নাবানা গুইত্তি, দেবা গুইত্তি ও কালেয়া গুইত্তি।
৫। স্মেলং গছা ডেল বা দল	ঃ	আমেলা গুইত্তি, আলু গুইত্তি, তেমেলে গুইত্তি ও পক্ত গুইত্তি।
৬। ল্লাংগছা ডেল বা দল	ঃ	বেদব গুইত্তি, শক্কা গুইত্তি, লাম্বায়া গুইত্তি ও বলা গুইত্তি।
৭। অঙ্য গছা	ঃ	এদের গছা গুইত্তির লোক আরাকানসহ বার্মায় রয়েছে। অনেক পরিবার বার্মা জাতিতে মিশেও গেছে। বাংলাদেশের পার্বত্য জেলায় যেসব অঙ্য গছা এককালে ছিলো তারা সবাই মোগছা ও ধৈন্যা গছার সাথে অন্তর্ভূক্ত হয়। কক্সবাজার জেলার রামু, উখিয়া ও টেকনাফ থানার লোকেরা চাংমা লিখে থাকে।

(সূত্রঃ তঞ্চঙ্গ্যা জাতি, লেখকঃ রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা)

২.২ **জন্ম, মৃত্যু, বিবাহে রীতিনীতির বাধ্যবাধকতাঃ** জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ এ তিনটি অধ্যায়কে তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠী তাদের সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজসিদ্ধ করেছে। এসব রীতি ও আচার-অনুষ্ঠানকে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে অলজ্ঘনীয় করা হয়েছে।

২.২.১ **শিশুর জন্মশুদ্ধি ও সামাজিক আচারঃ** তঞ্চঙ্গ্যা পরিবারে শিশু জন্মের সময় প্রসূতিকে সাহায্য করার জন্য ধাত্রী (অসা-মেলা) ডাকা হয়। শিশু ভূমিষ্ট হবার পর তার নাভিরুজ্জু বাঁশের ফালি থেকে নেয়া 'দুলুক্' (তীক্ষ্ণ ধারালো) দিয়ে কাটা হয়। নবজাত শিশুকে সহনীয় গরম জলে স্নান করিয়ে মায়ের পাশে শুকনা কাপড় জড়িয়ে রাখা হয়। অশুচি সময় পর্যন্ত প্রসূতিকে আঁতুর ঘরে সন্তানসহ থাকতে হয়। এ সময় তার ব্যবহার্য জিনিস ছাড়া সংসারের অন্যান্য জিনিসপত্র স্পর্শ করা তার জন্য নিষিদ্ধ। অশুচিকাল শেষ হলে (এক পাত্র পানির মধ্যে 'ঘিলা' নামক বীচির শাঁস এবং 'কশৈই' নামের বনৌষধি, হলুদের টুকরাসহ সোনা ও রূপা রেখে) 'ঘিলা-কশৈই পানি' বা পবিত্র পানি প্রসূতি ও নবজাতকের উপর এবং আঁতুর ঘরের চারিদিকে ছিটিয়ে শুচিশুদ্ধ করা হয়। এ অনুষ্ঠানকে 'কশৈই-পানি লনা' বলে। অনুষ্ঠানের দিনে ধাত্রী বা 'অসা মেলা'কে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয় এবং তার প্রাপ্য পারিশ্রমিক পরিশোধ করা হয়। তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের রীতি অনুসারে এই অনুষ্ঠানকে 'নাঈ কাবা তাঙা' দেওয়া বলা হয়। এরপর প্রসূতি সংসারের স্বাভাবিক কাজকর্মে অংশ নেয়।

Scanned with OKEN Scanner

২.৩ বিবাহ রীতিঃ-

২.৩.১ **তেম্মাং (শলাপরামর্শ)ঃ** বিবাহযোগ্য পাত্রের পিতা-মাতা, অভিভাবক বা আত্মীয়স্বজন তাদের পছন্দনীয় পাত্রীর সন্ধান পেলে অথবা পুত্রের মনোনীত বা পছন্দের পাত্রীর খোঁজ পেলে ঘরোয়া বৈঠকে শলাপরামর্শ করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

২.৩.২ **বউ পুছা গরানাঃ** প্রাথমিকভাবে পাত্রীপক্ষের সম্মতি পাওয়া গেলে শুভদিন নির্ধারণ করে পাত্র পক্ষকে পাত্রীর বাড়িতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যেতে হয়। পাত্রীর বাড়িতে এক জোড়া নারকেল, পান-সুপারী, পিঠাসহ নানা উপকরণ নিয়ে 'বউ পুছা গরানা' যেতে হয়। এভাবে তিনবার পাত্রীর বাড়িতে যেতে হয় এবং তৃতীয়বারে বিয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। বিয়ের প্রস্তাবের প্রথমবারেই পাত্রীপক্ষ রাজী হয় না। তবে ইচ্ছা হলে পাত্রপক্ষের দ্বিতীয়বারের প্রস্তাবে পাত্রীপক্ষ বিয়ের সম্মতি দিতে পারে। বিয়েতে পাত্রীপক্ষ সম্মত হলেই পাত্রপক্ষের নিয়ে যাওয়া উপকরণ সামগ্রী গ্রহণ করে এবং পাত্রপক্ষকে আপ্যায়নের মাধ্যমে বিয়ের শুভদিন ও দাভাসহ বোয়ালী/সাজনী সামগ্রীর পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।

২.৩.৩ **দাভাঃ** তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে কনেপণ (দাভা) প্রথা প্রচলিত আছে। পাত্র বা তার পিতাকে পাত্রীর পিতার নিকট নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ পণ হিসেবে পরিশোধ করতে হয়। এই পণ প্রথাকে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় 'দাভা' বলে। দাভা পরিশোধ করা সামাজিক নিয়মে বাধ্যতামূলক। তবে মনোমিলনে বা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে হলে পাত্রীর বাবা পাত্রপক্ষের কাছে দাভা বেশী দাবী করতে পারেন। কন্যা পালিয়ে গেলে বা পিতার অমতে বিয়ে করলে পিতা তার কন্যাকে তিনবার পর্যন্ত নিজ হেফাজতে ফেরৎ পাবার অধিকার রাখেন। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় দাভার পরিবর্তে পাত্রীর মাকে 'দুধলী পয়সা' (মেয়েকে বুকের দুধ খাওয়ানো বাবদ) হিসেবে কিছু টাকা উপঢৌকনস্বরূপ দেয়া হয়।

২.৩.৪ **সাজনীঃ** তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের সামাজিক/নিয়মিত বিয়েতে কনে সাজানোর কাপড়-চোপড়, অলংকার ও প্রসাধনী সামগ্রী পাত্রপক্ষের কাছে দাবী করা হয়। এসব সামগ্রীকে সাজনী বলা হয়। কনেপক্ষের দাবী করা সাজনী দিতে বরপক্ষ বাধ্য থাকে এবং এটি কনের সম্পত্তি বা স্ত্রী ধন হিসেবে গণ্য হয়। বউ পুছা গরানার এ সকল আনুষ্ঠানিকতার পর কোনো কারণে যদি কনেপক্ষ বিয়েতে অসম্মতি জানায়, তাহলে সমাজের কাছে সেটা অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় এবং পাত্রের বাবা কিংবা অভিভাবকের নিকট পাত্রীর বাবাকে সামাজিক দন্ড হিসেবে ক্ষমা প্রার্থনা করে 'লাজভার' (জরিমানা) দিতে হয়। পাত্রপক্ষের বেলাতেও অনুরূপ অপরাধের জন্য দন্ড দিতে হয়। সাধারণতঃ যে পাত্রীর বউ পুছা গরানা হয় সেই বিয়ের প্রস্তাব ভেঙ্গে না গেলে অন্য কোনো পাত্রের পক্ষ থেকে সেই পাত্রীর জন্য বিয়ের প্রস্তাব দেয়া সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ।

Scanned with OKEN Scanner

২.৩.৫ **বউ খজা যানা (বরযাত্রী যাওয়া)ঃ** বিয়ের (সাঙা) দিন বরকে সাজিয়ে নিয়ে বয়স্ক একজন পুরুষ ও একজন মহিলা (এ'দুজন বরের বাবা ও মায়ের ভূমিকা পালন করে থাকেন) কনের সাজনী সামগ্রীসহ বরযাত্রীর সাথে রওয়ানা হয়। সাজনী সামগ্রী ভর্তি 'ফো-কাল্লং' নেবার জন্য বরের চেয়ে বয়সে ছোট একজন কিশোরী বা যুবতীকে দায়িত্ব দেয়া হয়। বরের বন্ধু বা দুলাভাই সম্পর্কিত একজনকে অবশ্যই সাথে থাকতে হয়। তিনি সর্বদা বরের পাশে থেকে বিয়ের অনুষ্ঠানে সহায়তা করেন এবং বরের পক্ষে কথা বলেন। তাঁকে 'সাবালা' বলা হয়। প্রথমে সাবালা, এরপর বর ও বরের পেছনে 'ফো-কাল্লং' বহনকারী, এভাবে সারিবদ্ধ হয়ে পুরুষ ও মহিলা মিলে বেজোড় সংখ্যক বরযাত্রী দল রওয়ানা হবার রীতি আছে। আবার নতুন বউ নিয়ে জোড় সংখ্যা মিলিয়ে বরযাত্রীদের ফিরে আসার নিয়ম রয়েছে।

২.৩.৬ **জামাই তোলা (বরবরণ)ঃ** কনের বাড়িতে বরযাত্রীদল পৌঁছার সাথে সাথে বিয়ের আসরে কনেকে লুকিয়ে (বউ লুগানা) রাখা হয়। কনের চেয়ে ছোট বয়সের একজন কিশোরী বাড়ির দরজায় বরের বাবা-মা ও বরের পা ধুয়ে দিয়ে ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়। কনের ভাবী বা ভাবী সম্পর্কের একজন মহিলা যার কোনো সন্তান মারা যায়নি এমন অথবা ভগ্নিপতি সম্পর্কীয় একজন পুরুষ এসে একটি ডিম হাতে নিয়ে বরের মাথার চারপাশে ঘুরিয়ে পেছন দিকে ছুড়ে ফেলে দেন। এরপর তিনি নিজের ডানহাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল দিয়ে বরের বামহাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল ধরে বরকে ঘরে তুলে নিয়ে কনের পাশে বসিয়ে দেন। এ সময় বর ও কনে উভয়ের মাঝখানে পর্দার আড়াল রাখা হয়। কনের জন্য আনা সাজনী সামগ্রী দিয়ে বউ সাজানো শেষে সেই পর্দা সরিয়ে দেয়া হয়।

২.৩.৭ **ল্লাত্তংবানা বা ফং গরানাঃ** কনেপক্ষের একজন 'সাবালা' বিয়ের অনুষ্ঠানে বর ও কনেকে ঘনিষ্টভাবে পাশাপাশি বসিয়ে দিয়ে একটি সাদা কাপড় দিয়ে উভয়ের কোমড় বেঁধে দেয়। এরপর কনের ডান হাতের তালুর উপর বরের ডানহাতের তালু রেখে সাবালাকে মঙ্গল ঘট হাতে নিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের কাছে পর পর তিনবার বিয়ে সম্পন্ন করার অনুমতি চাইতে হয় (অমুকের লগে অমুকের ল্লাত্তং বানি দির/ফং গরি দির, হুগুম আগে নি নেই)। সকলে সমবেত কন্ঠে সম্মতি জ্ঞাপনের (আছে, আছে, আছে) পর সাবালা মঙ্গল ঘটের পানি বর-কনের হাতের তালুতে ঢেলে দিয়ে ল্লাত্তংবানা/ফং গরানা সম্পন্ন করে বিবাহ কর্ম সমাজসিদ্ধ করেন। এ সময় 'সাবালা' ও উপস্থিত সকলে সমবেত কন্ঠে 'পাত-তুরুতুরু' শব্দে বিয়ের শুভ সূচনা করেন। এরপর বর ও কনেকে সাবালা ৭ বার ওঠা-বসা করান। এটাকে বলা হয় 'নাচে দেনা' (আনন্দে নৃত্য করা)। বিয়ের দিনে 'চুমুলাঙ' পূজা করা হয়।

Scanned with OKEN Scanner

২.৩.৮ **চুমুলাঙ পূজাঃ** চুমুলাঙ পূজা একটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান ছাড়া বিয়ে সমাজসিদ্ধ হয় না বা স্বামী-স্ত্রী রূপে একের ওপর অপরের প্রতি সামাজিক অধিকার জন্মায় না। এই অনুষ্ঠানে ডিম, মোরগ-মুরগী ও মালা (পুরুষ) শুকর ইত্যাদি বলি দিতে হয় এবং মদ পরিবেশন করতে হয়। পরমেশ্বরী, লক্ষ্মী, কালিয়া, নেই নাইঙ্যা বা রাক্ষল্যা দেবতার উদ্দেশ্যে 'ওসা' (ওঝা) দিয়ে চুমুলাঙ পূজা করা হয়। বিবাহের ভবিষ্যত ভাল-মন্দ দেখার জন্য ওসা'কে দিয়ে চম্বা দেখা হয়। (মৃত মোরগের ঠোটের নিচের যামী ও জিহবা দেখে ভাল-মন্দ গণনা করে ভবিষ্যৎ বাণী করাকে 'চম্বা চানা' বলে)। আধুনিক তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে বর্তমানে চুমুলাঙ পূজার প্রচলন কমে গিয়ে অধিকাংশ বিয়েতে বৌদ্ধ ভিক্ষু এনে ধর্মীয় আচার পালন করা হয়।

২.৩.৯ **সেফ মাগানাঃ** ল্লাত্তংবানা অনুষ্ঠানের পর নবদম্পতিকে মাথায় পাগড়ী (খবং ও ভং) পরিয়ে উপস্থিত গুরুজন ও গণ্যমান্য বয়স্কদের ষষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করে আশীর্বাদ গ্রহণ করতে হয়। আশীর্বাদকারীরা তুলাতে সামান্য থু থু (সেফবত্তা) দিয়ে নবদম্পতির সুখ ও মঙ্গল কামনা করে তাদের মাথায় গুঁজে দেয়। এতে তুলা, চাউল, খই এসবের ব্যবহারেরও প্রচলন আছে।

২.৩.১০ **খানা সিরানাঃ** বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষে কনের বাড়িতে আসা বরযাত্রী, পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজনসহ ও আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে পরিবারের সামর্থ্য অনুযায়ী ভোজে আপ্যায়ন করা হয়। এটিকে 'খানা সিরানা' বলে। এই ভোজ বা খানা না দিলে সেই বিবাহিত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার লাশ কাঁধে না তুলে হাঁটুর নিচে রেখে অসম্মানজনকভাবে শ্মশানে নেওয়া হয়।

২.৩.১১ **বউ তুলানা (বধুবরণ)ঃ** বিয়ের পর ৭ দিন পর্যন্ত (বর্তমানে ১/২ দিন) বরকে শ্বশুর বাড়িতে থাকার নিয়ম আছে। এরপর নতুন বউ নিয়ে বরযাত্রীরা বরের বাড়িতে ফিরে এলে বউ তুলানা (বধুবরণ) অনুষ্ঠানে বর-বধুকে ফুল দিয়ে সাজানো ঘরে নিয়ে বসানো হয়। এসময় বৌদ্ধ ভিক্ষুকে আমন্ত্রণ করে এনে মঙ্গল সূত্র শ্রবণের মধ্য দিয়ে মাঙ্গলিক আচার সম্পন্ন করা হয়। বউ তুলানা উপলক্ষে বরের বাড়িতেও ভোজের (খানা সিরানা) আয়োজন করা হয়।

২.৩.১২ **সেফ মাগা যানাঃ** বরের বাড়িতে ২/৩ দিন অবস্থানের পর কনের বাপের বাড়িতে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে যেতে হয়। নবদম্পতি, সাবালা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনসহ কনের বাড়িতে পান-সুপারী, নারিকেল ও অন্যান্য উপহার সামগ্রী নিয়ে 'সেফ মাগা যানা' বা আশীর্বাদ নিতে যেতে হয়।

২.৪ **সৎকার রীতিঃ** তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে কারো মৃত্যু হলে মৃত ব্যক্তির মুখের ভেতর একটি ধাতব মুদ্রা দেয়া হয়। এ ধাতব মুদ্রাকে 'মুঅতাঙা' অর্থাৎ মুখের টাকা বলা হয়।

Scanned with OKEN Scanner

ঐ টাকা দেয়ার উদ্দেশ্য হলো মৃত ব্যক্তির আত্মাকে পরলোকে অর্থাৎ ভবনদীর অপর পারে পাড়ি দেবার খরচ দেয়া। তারপর মৃত ব্যক্তিকে স্নান করিয়ে এবং নতুন সাদা কাপড় পড়িয়ে বাঁশের তৈরী শবাধার (তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় সামাইন ঘর) এর উপর আপাদমস্তক ঢেকে রাখা হয়। আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতরা মরদেহের বুকের উপর ইচ্ছানুসারে টাকা-পয়সা রেখে যায়। এসব টাকা-পয়সাকে 'বুগতাঙা' অর্থাৎ বুকের টাকা বলা হয়। মৃতের ঘরের দরজায় একটি মাটির পাত্রে তুষের আগুন জ্বালিয়ে 'আইল্যা বেলা' রাখা হয়। মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনেরা ৭ দিন অর্থাৎ সাপ্তাহিক ক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কোনো আমিষ আহার করেন না। শব দাহ করার পরের দিন মৃত ব্যক্তির পুত্র সন্তানেরা মাথা মুড়িয়ে ফেলে।

বুধবার কিংবা অমাবশ্যার দিনে শবদেহকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে রীতি বিরুদ্ধ। তাই মৃতদেহকে প্রয়োজনে ১/২ রাত পর্যন্ত রাখা যায়। শবদেহকে শ্মশানে নেয়ার আগে ওঝা বা বৈদ্য দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে অন্যান্য জীবিত আত্মীয়স্বজনের সাথে (মরা-জেদা ফারগ গরনী) পৃথক করা হয়। এ প্রথা কারবয়া, মংলা, মুঅ ও ধৈন্যা গছা (গোত্র) সহ সকল তঞ্চঙ্গ্যারা পালন করে। শ্মশানে নিয়ে যাবার দিনে সকালে বাড়ীর উঠানে কাঠের শবাধার বানিয়ে শবদেহ রাখা হয়। মৃতের জন্য ভাত রান্না করে সামান্য কিছু ভাত শবের মুখে গুঁজে দিয়ে অবশিষ্টাংশ কলা পাতায় মুড়ে শবের সঙ্গে দেয়া হয়। এর কারণ হলোঃ- পরিবারের কেউ বহু দুরের পথে কোথাও গেলে যেমন বাড়িতে ভাত খেয়ে আরো কিছু ভাত মোচায় (পুটলি) বেধে সঙ্গে নিয়ে যায়, সে রূপ মৃত ব্যক্তির সাথেও দেয়া হয়। শবদেহকে শ্মশানে নিয়ে যাবার আগেই শ্মশান যাত্রীরা বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিকট পঞ্চশীল গ্রহণ ও মঙ্গল-সূত্র শ্রবণ করে মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্‌গতি ও মঙ্গল কামনায় সাধ্য মতো টাকা-পয়সা দান বা উৎসর্গ করে। শ্মশানে শুকনা কাঠ দিয়ে চিতা (রূবাকু) তৈরী করে রাখা হয়। রূবাকু তৈরীতে পুরুষের বেলায় ৫ স্তর আর স্ত্রীলোকের বেলায় ৭ স্তর করা হয়। পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে দক্ষিণ দিকে পা ও উত্তরমুখী মাথা করে চিতায় তোলা হয়। ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি অনুসারে আচার অনুষ্ঠান শেষে প্রথমে জ্যেষ্ঠ পুত্র কিংবা তার অনুপস্থিতিতে অন্য পুত্রগণ অথবা কোনো নিকটাত্মীয় ৭ বার চিতা প্রদক্ষিণ করে শবদেহের মুখে এবং পরে চিতায় আগুন দেয়। বসন্ত, কলেরা ইত্যাদি দূরারোগ্য কোনো সংক্রামক রোগের কারণে কেউ মারা গেলে মৃত ব্যক্তির লাশ দাহ না করে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। শবদাহ শেষে শ্মশান হতে ফিরে আসা শ্মশান যাত্রীরা স্নান ঘরের দরজায় রাখা চন্দন মিশ্রিত পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে কিছু পানি মাথায় ছিটিয়ে দেয়। তারপর তিতা পানি মুখে দিয়ে শুদ্ধ হয়ে নিজ নিজ ঘরে প্রবেশ করে।

শবদাহের পরদিন সকালে শ্মশানে গিয়ে পুত্র সন্তান বা স্বগোত্রীয় যে কেউ শবদেহের ছাইভস্ম থেকে বিভিন্ন অস্থির সামান্য অংশ সংগ্রহ করে মাটির একটি নতুন হাঁড়িতে

Scanned with OKEN Scanner

রেখে সাদা নতুন কাপড় দিয়ে হাঁড়ির মুখ বেঁধে রাখে। তারপর পানিতে ডুব দিয়ে মাটির হাঁড়িটি মাথার উপর থেকে পেছনের দিকে ঠেলে দেয়। ঐ ডুবে থাকা ব্যক্তি তার ডান হাত পানির উপরে তোলার সঙ্গে সঙ্গে অপর একজন তার কনিষ্ঠ আঙ্গুলে সুতা বেঁধে টেনে তুলে নেয়। তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের লোকবিশ্বাস হলো, এভাবে অস্থি নদীতে ফেলে দিলে অস্থির কোনো একটি অংশ এক সময় ভেসে গিয়ে পবিত্র গঙ্গা নদীতে ও বুদ্ধ গয়ায় পৌঁছাবে এবং তাতে মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্গতি হবে।

অস্থি বিসর্জনের আগে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে চিতার চারকোণা ঘিরে ৭ নাল (প্রস্থ) সাদা সুতা পেঁচিয়ে উপরে 'চান্দাল-কানি' (চাঁদোয়া) খাটিয়ে দেয়া হয়। ঘেরার মাঝখানে একটি জলপূর্ণ কলসীর মুখ সাদা কাপড় দিয়ে বেধে রেখে দেয়া হয়। তারপর ৪ খন্ড বাঁশের আগায় চারখানা লম্বা সাদা কাপড়ের ফালি বেধে শ্মশানের চারকোণায় পুঁতে দেয়া হয়। এগুলোকে 'থাঙোইন্' (ধ্বজা) বলে।

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে শবদাহের ৬ দিন পর সাপ্তাহিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানকে 'সাতদিন্যা' বলে। এ অনুষ্ঠানে মৃতের আত্মার সদ্গতি কামনায় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আমন্ত্রণ করে মঙ্গলসূত্র শ্রবণ এবং আত্মীয়স্বজন ও সমাজের লোকজনদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। পরিবারের সাধ্যানুসারে ভোজনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্গতি ও শান্তি কামনা করে টাকা-পয়সা এবং বিবিধ দানীয় সামগ্রী ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে।

২.৫ <u>সামাজিক রীতিনীতিসমূহঃ-</u>

২.৫.১ <u>পৈ-অ বাদ/জার-অ বাদঃ</u> তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে গরবা কুদুমের (নিষিদ্ধ সম্পর্কীয় আত্মীয়) সাথে বিয়ের কারণে ছিনালী অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত পুরুষ কিংবা নারী সামাজিক বিচারের দন্ডাদেশ প্রতিপালন না করা পর্যন্ত সমাজচ্যুত বলে গণ্য হয়। এ সময়ে তাদের সাথে কোনো রকমের সামাজিক সম্পর্ক বা যোগাযোগ রাখা নিষিদ্ধ। একে বলা হয় 'পৈ-অ বাদ/জার-অ বাদ'। ছিনালী অপরাধে শাস্তি প্রাপ্ত পুরুষ এবং নারী উভয়কে বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিকট মন্ত্র শুনে শুদ্ধ হবার আদেশ দেয়া হয়। কোনো কোনো সামাজিক আদালতে অতিরিক্ত শাস্তি হিসেবে অপরাধী মহিলা ও পুরুষকে কোনো বটগাছের গোঁড়ায় নির্দিষ্ট সংখ্যক কলসীর জল ঢালার নির্দেশ দেয়া হতো। তখনকার দিনে পুরুষ অপরাধীদের মুরগীর খাঁচা গলায় ঝুলিয়ে, ফাটা বাঁশের ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে নিজের অপরাধের কাহিনী বলতে বলতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করতে হতো। অপরাধী দু'জনের মাথার চুল উপর নীচে তিনভাগ করে মাঝখানের চুলগুলো কেটে দেয়া হতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপরাধীকে শুকরের খোঁয়ারে বেঁধে রেখে শুকরের মতো মুখ দিয়ে খাবার খেতে বাধ্য করা হতো। কারণ তারা মানুষ হিসেবে সভ্য আচরণ না করে সম্পর্কের বারণ না মেনে পশুর মতো যৌন সংসর্গ করেছে বলে সমাজ এ শাস্তি দেয়।

Scanned with OKEN Scanner

২.৫.২ **গাবুজ্যা দেবানঃ** তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে দেবান বা গাবুজ্যা দেবান নামের মৌখিক পদবীধারী যুবক সর্দার ছিল এবং গ্রামাঞ্চলে এখনো আছে। সাধারণতঃ কোনো গ্রাম বা এলাকার বয়োজ্যেষ্ঠ অবিবাহিত যুবকই এ পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে। তবে বিয়ের পর এ পদাধিকার তার আর থাকে না। তখন অন্য একজনের হাতে দায়িত্ব অর্পিত হয়। তার এলাকাধীন সকল যুবক-যুবতীর উপর নজরদারী করা তার প্রধান দায়িত্ব। তার এলাকার মধ্যে অন্য এলাকার যুবক যদি তার অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো যুবতীর বাড়ীতে রাত্রি যাপন বা যুবতীর সাথে অবাধে মেলামেশা করে, তাহলে সেই যুবককে জবাবদিহি করতে হয়। দেবানের অজ্ঞাতে নিজ এলাকার কোনো যুবতী ভিন্ন এলাকায় গমন, রাত্রি যাপন, এমনকি মেলা বা বিয়ের নিমন্ত্রণে গেলে এই নিয়ম ভঙ্গের কারণে সেই যুবতীকে দেবান সতর্ক করতে পারে। যদি যুবক-যুবতীর গোপন প্রণয়, অবৈধ কাজে ধরা পড়া, বিয়ের প্রস্তাব, মা-বাবার অজ্ঞাতে অন্য পুরুষের সাথে পলায়ন কিংবা অসাঙ্যা বা গরবা কুদুমের (নিষিদ্ধ সম্পর্কীয় আত্মীয়) সাথে যৌন সম্পর্ক বিষয়ে কোনোরূপ সন্দেহ বা ঘটনা প্রমাণিত হয়, তাহলে গ্রামের সালিশ/বিচারে দেবানকেও অভিযুক্ত করা হয়। কেননা যুবতীদের দেখাশুনার দায়িত্ব দেবানের উপর থাকে। এলাকার সকল যুবক-যুবতীদের সামাজিক নিয়মকানুন মেনে চলা এবং শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে দেবানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২.৫.৩ **প্রথম সন্তান ভাদ্র মাসে ভূমিষ্ট হওয়াঃ** কোনো দম্পতির প্রথম সন্তান ভাদ্র মাসে ভূমিষ্ট হলে সংসারে অমঙ্গল ডেকে আনবে মনে করে সেই সন্তানকে পানিতে ভাসিয়ে দিয়ে পুনরায় কিনে নিতে হয়। কোনো দম্পতির প্রথম সন্তান ভাদ্র মাসে ভূমিষ্ট হলে সেই নবজাত শিশু ও মা'কে একটি কলা গাছের বা বাঁশের ভেলায় পাহাড়ী ছড়া বা নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। ভেলা কিছু দূর ভেসে গেলে 'অসামেল' (ধাত্রী) (অনেক ক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত কেউ) ভেলাটিকে কুলে এনে নবজাত শিশুসহ মা'কে নিজ হেফাজতে নেয়। তখন নবজাত সন্তানের পিতা তার সন্তান ও স্ত্রীকে উক্ত ব্যক্তির নিকট থেকে কিনে নিয়ে নিজ বাড়ীতে ফিরিয়ে আনে। ভেলা থেকে মা-শিশুকে উদ্ধারকারী ব্যক্তি যদি বিক্রি না করে নিজ হেফাজতে রাখতে চায় সেক্ষেত্রে রীতি অনুসারে তাকে বিক্রি করতে বাধ্য করা যায় না। তবে এ ধরণের ঘটনার উদাহরণ সাধারণতঃ সমাজে দেখা যায় না। এই নিয়ম তঞ্চঙ্গ্যাদের সব গছা-গুত্তির মধ্যে রয়েছে।

২.৫.৪ **পৈঃ** সন্তানের জন্য বাবা-মা বিভিন্ন পৈ মানৎ (মানস) করেন। ছেলে সন্তান হলে ধুতি-পৈ, কন্যা সন্তান হলে খাদি-পৈ, কানফোঁড়া-পৈ ইত্যাদি। পৈ অর্থ হলো অর্ঘ্য বা পূজা। কোনো দম্পতি যদি মানৎ করেন যে, পুত্র সন্তান হলে 'ধুতি-পৈ' করবেন, তাহলে পুত্র সন্তান জন্মের পর সন্তানের কাপড় পড়ার বয়সে ধুতি-পৈ অনুষ্ঠান না করা পর্যন্ত সন্তানটি ধুতি পড়তে পারবে না। তেমনি কন্যা সন্তানের বেলাতেও 'খাদি' (বক্ষ বন্ধনী) কানফোঁড়া ইত্যাদি পৈ অনুষ্ঠান একই উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে।

Scanned with OKEN Scanner

পৈ অনুষ্ঠানে সাধ্যানুসারে মোরগ-মুরগী, শুকর, ছাগল এসবের মাংসের সাথে প্রচুর মদ, জগরা, কাঞ্চি, ফুসী ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। পৈ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের ইচ্ছামত মাংস খেতে দেয়া হয়। এভাবে ইচ্ছামত মাংস খাওয়াটাকে বলা হয় 'খাসি খাওয়া'। এরপর যার জন্য পৈ করা হয়, তাকে নতুন জামা, ধুতি ও সাদা খবং পরিয়ে উপস্থিত অতিথিদের সামনে আনা হয়। সে সবার উদ্দেশ্যে ষষ্ঠাঙ্গে প্রণাম জানালে উপস্থিত সকলে আশীর্বাদ স্বরূপ পৈ-এ টাকা-পয়সা দেন। পৈ-এ আশীর্বাদের টাকা দিতে হয় বয়োজ্যেষ্ঠতা বা পদবী অনুসারে। পৈ দেয়া হয় সাধারণতঃ বয়স্ক বা পদবী অনুসারে সবচেয়ে সম্মনিত ব্যক্তির হাতে। তিনি যত টাকা আশীর্বাদ স্বরূপ দেবেন তার পরবর্তী জনেরা সেই পরিমাণ পর্যন্ত টাকা দিতে পারে, তার বেশী দিতে পারে না। যদি কেউ বেশী টাকা দেন তাহলে সেটাকে বাহাদুরী বা প্রথম ব্যক্তির মানহানি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২.৫.৫ **গৃহ নির্মাণ রীতিঃ** গৃহ নির্মাণের জন্য সর্বপ্রথম যে হ্আম অর্থাৎ খুঁটিকে গর্তে বসানো হয় তাকে বলা হয় মুহ্আম বা মূল খুঁটি। মুহ্আম গর্তে বসানোর পূর্বে গর্তের ভেতর সোনা, রূপা কিংবা সোনা-রূপার পানি, চন্দনের পানি, ঘিলা কচোই এর পানি দিয়ে শুদ্ধ করে নিতে হয়। এরপর হ্আমের মাথায় তীরসহ ধনু, আমের পল্লব, ছোট কলা গাছ বেঁধে দিতে হয়। এর অর্থ সেই বাড়ীর উপর আকাশ হতে দেবতারা যাতে বজ্রপাত না করে। অনেক সময় গৃহ নির্মাণের আগে বৈদ্য দিয়ে মন্ত্র পড়ানো হয় এবং পাথরের উপর আং (দেবতার চিত্র) অংকন করে ঘরের চারদিকের চারকোণায় সে আং মাটিতে পুঁতে দেয়া হয়।

২.৫.৬ **আংঃ** এককালে আদিবাসী সমাজে যেমন ছিল সুখ সমৃদ্ধি, তেমনি মানুষও ছিল সত্যবাদী এবং দয়ালু। যার কারণে তন্ত্র-মন্ত্রের জ্ঞান ও গুণ অব্যর্থ ছিল। কঠিন ব্যাধি থেকে আরোগ্য পাওয়া যেতো বনের গাছ-গাছালী ও লতাপাতা সেবনে। পোড়া মাটির ফলক কিংবা কালো পাথরের উপর 'আং' (দেবতার জীবন চিত্র) অংকন করে সেটি মন্ত্র জপ করতে করতে জীবন্ত করা হতো। মারণ, বশীকরণ, সম্মোহন এবং চিকিৎসাও করা হতো এই আং দিয়ে। গ্রাম কিংবা পরিবারের অমঙ্গল আং দ্বারা দুর করা যায় এমন বিশ্বাস সমাজে রয়েছে।

২.৫.৭ **শুভাশুভ আচার/রীতিঃ** ঘরের উঠানে বা ঘরের চালের সাথে যুক্ত বা যাতায়াতের পথে কাপড় শুকানোর বাঁশ কিংবা দড়ি টাঙানো থাকলে তার নিচ দিয়ে যাতায়াত করা অশুভ।

- ঘরের ভেতরে জুতা সেন্ডেল পায়ে দিয়ে প্রবেশ করা গেরস্থের অমঙ্গল বলে বিশ্বাস করা হয়।

Scanned with OKEN Scanner

- ঘর থেকে বের হবার সময় দরজায় পা আছড়ানো বা পা ঝাড়া দেয়া গেরস্থের অমঙ্গল মনে করা হয়।
- ঘর ঝাড়ু দেয়ার পর দরজায় ঝাড়ু আছড়ানো উচিৎ নয়। এরকম করলে সে ঘরে লক্ষ্মী বাস করে না।
- যে নারী ঘরের দরজায় চুল আচড়াতে থাকে বা রূপচর্চা করে সে নারী অপয়া।
- চালের শন টেনে নিয়ে বা বেড়ার তর্জা খুলে যে রমণী চুলায় আগুন জ্বালে সে রমণী চির দুঃখিনী হয়।
- পা হেঁচড়ে হাঁটা কুলক্ষণযুক্ত ও শনির দৃষ্টি পড়ে।
- ঘুম থেকে ওঠার পর যে রমণী হাত মুখ না ধুয়ে খাদ্য দ্রব্যের উপর হাত দেয় সে রমণী কুলক্ষণা ও অলক্ষ্মী হিসেবে গণ্য।
- পিড়ায় বসে ভাতের থাল নিচে রেখে বা পায়ের উপর ভাতের থাল রেখে ভাত খেলে সে ঘরে লক্ষ্মী থাকে না।
- ভাত খাবার সময় তর্জনীর আঙ্গুল উঁচু করে মুখে ভাত দেয়া, জিহবা বের করে খাওয়া, চট্‌চট্‌ শব্দ করে খাওয়া এবং পা সামনে টেনে খাওয়া কুচরিত্র স্বভাব, তার দুঃখ চিরকাল।
- চুলার আগুন অন্যজনকে একাধিকবার দেয়া বারণ।
- রান্নার পর চুলার ছাই সন্ধ্যা বেলায় যে নারী ফেলে দেয়, সে নারী কুলক্ষণা।
- ঘরের হ্‌আম বা বেড়ার উপরে দা দিয়ে দাগ কাটলে গৃহকর্তা ঋণগ্রস্ত হয়।
- পুড়ে যাওয়া ঘরের হ্‌আম (খুঁটি) পুনরায় নতুন ঘরের খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা অকল্যাণকর।
- দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী (কিচিং অর্থাৎ গিরিপথ) স্থানে, ছড়া বা ঝিড়ির শেষ প্রান্তে, পরিত্যক্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপর, শ্মশানের উপর, মৃত পাগল কুকুর পুঁতে ফেলার স্থানে, পুঁতে রাখা বা মরা পশু ফেলার স্থানে, পানি চলাচল করে এমন সুড়ঙ্গের উপর যেখান থেকে লাল রঙের ফেনা বা গলিত পানি নির্গত হয় এসব স্থানে ঘর নির্মাণ করলে রোগ শোকে অপমৃত্যু হয় বলে মনে করা হয়।
- নিজ বংশের গুরুজন বা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির ঘরের সামনে কনিষ্ঠ জনের ঘর নির্মাণ করে বসবাস করা কোনো প্রকারেই উচিৎ নয়। এতে রোগ শোক এবং অপমৃত্যু অনিবার্য।
- ঘরের চালের ওপর দিয়ে মোরগ উড়ে গিয়ে ডাক দিলে শুভ হয়। আবার কারো বেলায় অশুভ হয়।

- ঘরের পালিত মুরগী নরম ডিম পাড়া অমঙ্গলের পূর্বাভাস। এক্ষেত্রে সবার অজ্ঞাতে সেই মুরগীটিকে বধ করে খেতে হয়। কলাগাছের পেট ফেটে থোঁড় বের হলে গেরস্থের অমঙ্গল বলে মনে করা হয়।
- ঘরের চালের উপর চিল বা পেঁচা বসা অমঙ্গলের লক্ষণ। তবে গৃহকর্তা নিজে না দেখে অন্য কেউ জানিয়ে গেলে অমঙ্গল হয় না।
- পানি ভরা কলসী কোমড়ে তোলার পর হঠাৎ ভেঙ্গে যাওয়া অমঙ্গলের লক্ষণ। এক্ষেত্রে সেই রমণী পানিতে ডুব দিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করলে বিপদ-আপদ মুক্ত হয়।
- স্নান করার পর ভেজা কাপড়ের পানি দিয়ে পা ধুয়ে ফেলা অমঙ্গল।
- নদীতে, ছড়ায়, গর্তে পায়খানাপ্রস্রাব করা অনুচিত।
- অন্যের ঘরের চালের পানি নিজের ঘরের চালে পড়া অমঙ্গল।
- পরিবারের কারো যদি ঘরের বাইরে মৃত্যু হয় তাহলে মৃত ব্যক্তিকে ঘরের ভেতরে নেওয়া উচিৎ নয়, তাকে উঠানে রাখতে হয়।
- একজনের কথা বলার সময় কেড়ে নিয়ে যদি অন্য কেউ কথা বলে তাহলে জেনে রাখা ভাল, সেই ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা উচিৎ নয় এবং তাদের বংশ বিশ্বাসঘাতক।
- যে সন্তান বৃদ্ধ পিতাকে বাবা ডাকে না বুজ্যা (বুড়া) ডাকে, বৃদ্ধ মাকে মা ডাকে না বুড়ি ডাকে সে সন্তানের জীবন খুবই কলঙ্কময় হয় এবং সেও তার সন্তানের কাছে অবিশ্বাসী হয়।
- ভাত খাবার সময় পরের সমালোচনা করলে নিজের অন্তরে পাপ জমা হয়।
- পুরুষ ব্যক্তির জীবনে একবার শ্রমণ হবার নিয়ম আছে। শ্রমণ না হলে তার মৃতদেহ আগুনে পোড়ানোর নিয়ম নেই।
- বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধার সাথে যে সন্তান সেবা যত্ন করে সে চারি প্রকার অপায় থেকে মুক্ত হয়।
- কাক-চিলের পায়খানা গায়ে পড়লে সরাসরি ঘরে প্রবেশ করা উচিৎ নয়। ঘরের বাইরে কাপড়-চোপড় ভিজিয়ে স্নান করে প্রবেশ করা উচিৎ।

২.৫.৮ **<u>সুতিকাগারঃ</u>** তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের প্রথা অনুসারে প্রসূতির সন্তান প্রসব অবশ্যই তার স্বামীগৃহে হতে হয়। স্ত্রীর পিতৃগৃহে সন্তান ভূমিষ্ট হলে অশুচি মনে করা হয়। যদি কোনো কারণে স্ত্রীর পিতৃগৃহে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহলে স্ত্রীর পিতৃগৃহের পার্শ্ববর্তী কোনো স্থানে আলাদা আঁতুর ঘর তৈরী করে দিতে হয়। স্ত্রীর পিতৃ পরিবারের কোনো সাহায্য প্রসূতি নিতে পারে না। তবে স্বামীর নিজ গোত্রের লোকজন বা কনের শ্বশুর বাড়ীর কেউ উপস্থিত থাকলে প্রসূতিকে সাহায্য করতে পারে। অতীতে এ নিয়মের কড়াকড়ি থাকলেও বর্তমানে অনেকটা শিথিল।

Scanned with OKEN Scanner

২.৬ **ধর্মীয় বিশ্বাস ও তঞ্চঙ্গ্যা সামাজিক প্রথাঃ** আদিবাসী তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠী জন্মসূত্রে প্রকৃতি পূজারী ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, যদি না তিনি স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে ঘোষণা এবং আচার-আচরণ দ্বারা এই ধর্ম পরিত্যাগ করেন। বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য ধর্মীয় অনুশাসন, শাস্ত্র ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে বিধিবদ্ধ আইন নেই। ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক আচার-আচরণের উপর তারা নির্ভরশীল। এ দেশের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা কোনো কারণে ধর্মীয় রীতিনীতি ও উত্তরাধিকার প্রশ্নে কোনো প্রকার আইনগত সমস্যার সম্মুখীন হলে, সেক্ষেত্রে ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন (৩৯নং আইন)[১৯] দ্বারা শাসিত হন। তবে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন মামলায় ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের (১৯৫৬ সনের আইন) ২(১) ধারার নিম্নরূপ সংযোজন হয়েছেঃ-

1. This act applies (A) to any person ....
(B) To any person who is a Buddhist, Jaina or Sikh by religion, and
(C) To any other person ....
Explanation:- The following persons are Hindus, Buddhist, Jaina or Sikhs by religion, as the case may be:-
(a) Any child legitimate or illigitimate both of whose parents are Hindus, Buddhists, Jaina or Sikhs by religion.
(b) Any child legitimate or illegitimate, one of whose parents is a Hindu, Buddhists, Jaina or Sikh by religion and who is brought up as a member of the tribe community group of Family to which such parent belongs or belonged.
(c) Any person who is convert or reconvert to the Hindu, Buddhist, Jaina or Sikh religion.

উপরোক্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় ভারতীয় হিন্দু উত্তরাধিকার আইন দ্বারা শাসিত ও আওতাভূক্ত। বাংলাদেশের বৌদ্ধগণ সচরাচর দায়ভাগা আইনের আওতায় উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে। ভারতের বৌদ্ধ সম্প্রদায় ১৯৫৬ সালের সংশোধিত হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের আওতাভূক্ত হলেও তা অদ্যাবধি বাংলাদেশের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে গৃহীত হয়নি। বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী মায়ানমার রাষ্ট্রের বৌদ্ধগণ Digest of Buddhist Law এবং Law of Menoo এর অধীনে পারিবারিক সমস্যা ও আইনগত উত্তরাধিকার নির্ণয় করে থাকেন। সঙ্গতভাবে প্রশ্ন আসে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় হিন্দু আইনের আওতাভূক্ত কি না?

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট আপীল বিভাগের দেওয়ানী আপীল নং- ৪০/১৯৮৪ হাইকোর্ট বিভাগ, কুমিল্লা বেঞ্চের দ্বিতীয় আপীল নং- ২১/১৯৮৩ মূলে ২০/০৬/১৯৮৩ইং তারিখে করতাল লক্ষী বিহার (আপীলকারী) বনাম হৃদয় রঞ্জন চৌধুরী গং (রেসপন্ডেন্ট) মামলায় প্রদত্ত আদেশ নিম্নরূপঃ- Leave was granted to

Scanned with OKEN Scanner

consider whether the Buddhists of Bangladesh are Governed by the Hindu Law in matters of succession.

Both the plaintiffs and defendants accepted the proposition that the Buddhists of Bangladesh are governed by dayabhaga Hindu law in matters of succession of the proposition laid down in 32 DLR 187 that "it cannot be said that Buddhists of our country are governed by Hindu law with regard to succession" is very sweeping (40 DLR 137 AD).

উপরোক্ত মোকদ্দমায় মাননীয় বিচারপতির মন্তব্যঃ '১৯৫৬ সনের ভারতীয় হিন্দু আইন সংশোধিত হয়েছে এবং ভারতীয় বৌদ্ধগণকে হিন্দু আইনের আওতায় আনা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের হিন্দু আইনে এরূপ কোনো সংশোধনী আনা হয়নি। সেহেতু বলা যাবে না বাংলাদেশের বৌদ্ধগণ উত্তরাধিকার প্রশ্নে হিন্দু আইন দ্বারা শাসিত'।

পার্বত্য তিন জেলায় তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও তাদের পারিবারিক সমস্যা ও উত্তরাধিকারের প্রশ্ন নিরসনে নিজস্ব সামাজিক বিচার পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে। উত্তরাধিকার প্রশ্নসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে তঞ্চঙ্গ্যাগণ অভিন্নভাবে সমাজে প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতি অনুসরণ করে থাকে, যা দীর্ঘদিন অনুসরণের মাধ্যমে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইনের গুরুত্ব অর্জন করেছে। তাই তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে বিশেষতঃ গ্রামীণ সমাজে বিভিন্ন দেবতা, অপদেবতা এবং প্রকৃতি পূজার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তা ধর্মীয় বিশ্বাস হিসেবে গণ্য হয় না।

জন্মসূত্রে একজন তঞ্চঙ্গ্যা যতক্ষণ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে ঘোষণা দিয়ে কিংবা আচার-আচরণ দ্বারা ধর্মীয় বিশ্বাস এবং কৃষ্টি, রীতিনীতি ও প্রথা পরিত্যাগ না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তঞ্চঙ্গ্যা হিসেবে গণ্য হবেন।

২.৭ **তঞ্চঙ্গ্যা প্রথাগত আইনের উৎসঃ** তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন প্রধানতঃ তাদের সামাজিক ও গোত্রগত প্রথা ও প্রচলিত রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। মূলতঃ বোমাং, মং ও চাকমা সার্কেলে বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠী দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের তুলনায় সংখ্যাগতভাবে যতো ছোটই হোক না কেন, তাদের সামাজিক, পারিবারিক ও গোত্রগত শৃঙ্খলা এবং শাসন সংহত রাখতে সমাজের অভিন্ন সর্বজনগ্রাহ্য বিশেষ কিছু নিয়ম, রীতিনীতি ও প্রথা তারা অনুসরণ করে। তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর প্রাচীন সমাজ কাঠামো অনুসারে তাদের গোত্রভেদে সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের কিছু তারতম্য রয়েছে। তা সত্ত্বেও তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে সর্বজনগ্রাহ্য কিছু অভিন্ন রীতিনীতি ও প্রথাভিত্তিক ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন অনুসৃত হয়ে থাকে। এছাড়াও তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে এমন কিছু লোকবিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার প্রচলন আছে, যেগুলো লিখিত কিংবা মৌখিকভাবে প্রচলিত। প্রচলিত

Scanned with OKEN Scanner

রীতিনীতি ও প্রথা পুরুষানুক্রমিকভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অনুসরণের মাধ্যমে প্রথাগত আইন রূপে সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে। যেমনঃ- দেব-দেবীর পূজার মন্ত্র ও নিয়ম পদ্ধতি পাণ্ডুলিপি আকারে তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, তাবিজ/মাদুলী লিখন বা প্রস্তুতকরণের পদ্ধতি, ভেষজ চিকিৎসা পদ্ধতি, জন্ম কুষ্টি ও রাশি বিচার, জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ে ধ্যান-ধারণা এবং মৌখিকভাবে প্রচলিত বংশানুক্রমিক রীতিনীতি। এ সকল বিষয় যদিও বৌদ্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে অনেক ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক, এতদসত্ত্বেও প্রয়োজনের তাগিদে এসব রীতিনীতি, কৃষ্টি, লোকবিশ্বাস ও প্রচলিত প্রথা তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে মেনে চলা হচ্ছে। সুপ্রাচীনকাল হতে আদিবাসী সমাজের স্মৃতি ও শ্রুতি নির্ভর এ সকল রীতিনীতি ও প্রথাসমূহকে সমাজের বিকাশ ও বিবর্তনের ধারায় ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন রূপে বিধিবদ্ধ আকারে সংরক্ষণের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের তাগিদে এখানে গ্রন্থণা করা হলো, যার অপরিসীম আইনী গুরুত্ব রয়েছে।

ব্রিটিশ শাসনামল হতে সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফ তাঁর অধঃস্তন হেডম্যান, কার্বারী দ্বারা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সামাজিক বিচার ও শাসন কার্য নিস্পন্ন করে আসছেন। ব্রিটিশ শাসনামলে ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনের আওতায় কার্বারী, হেডম্যান ও সার্কেল চীফ এ তিন স্তরের সামাজিক বিচার কাঠামোকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়। তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠী তাদের সামাজিক দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রতিপালনের পাশাপাশি সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা ভোগ যেমন করে তেমনি সমাজের শাসন-শৃঙ্খলা এবং রীতিনীতিসহ নিজেদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য রক্ষার স্বার্থে সমাজের কিছু বিধি নিষেধও মেনে চলে। একই সাথে বৌদ্ধ ধর্মীয় রীতিনীতি এবং প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য থেকে উদ্ভূত আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কার এবং প্রচলিত প্রথা অনুসরণের মাধ্যমে সমাজের প্রয়োজনে সর্বজনগ্রাহ্য অভিন্ন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইনের উদ্ভব হয়েছে। তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ তাদের সামাজিক দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রতিপালনের পাশাপাশি সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা ভোগ যেমন করে, তেমনি সামাজিক শাসন, রীতিনীতি এবং শৃঙ্খলাসহ নিজেদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্য রক্ষার স্বার্থে কিছু বিধি নিষেধও মেনে চলে। ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনের আওতায় সৃষ্ট কার্বারী, হেডম্যান, সার্কেল চীফ এ তিনটি প্রাতিষ্ঠানিক স্তরের সামাজিক ও পারিবারিক আদালত হতে বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত ও প্রতিবিধানের দ্বারা তাদের প্রথাগত আইনসমূহ সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে আইনের সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে এভাবে, 'আইন অর্থ কোনো আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, প্রজ্ঞাপন ও অন্যান্য দলিল এবং বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতা সম্পন্ন যে কোনো প্রথা বা রীতি'। প্রথাগত আইন সম্পর্কে অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যায় যা কিছুই থাকুক না কেন সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা অনুসারে প্রথাগত আইন অবশ্যই বাংলাদেশে প্রচলিত সকল ধরণের আইনের সমকক্ষ।

Scanned with OKEN Scanner

২.৮ **তঞ্চঙ্গ্যা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন প্রয়োগের অধিক্ষেত্রঃ** তঞ্চঙ্গ্যা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইনের অধিক্ষেত্র মূলতঃ চাকমা সার্কেল, বোমাং সার্কেল ও মং সার্কেলে বসবাসকারী তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যে সকল আইনের আওতায় তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা বা বিরোধসমূহের নিষ্পত্তি হচ্ছে এবং হবে, তা নিম্নরূপঃ-

ক) ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির ৪০ বিধি;

খ) ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন সংশোধনী (২০০৩ সনের ৩৮নং আইন) আইনের ৪(৪) ধারা;

গ) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর ৬৬ ধারামতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদি সামাজিক বিচার এবং ১ম তফশীলের ২৩নং কার্যাবলীর অধীনে;

ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনের[২০] ২২(ঙ) ধারা।

ঙ) পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন[২১] (২০০১ সনের ৫৩নং আইন) এর ৬নং ধারা।

২.৯ **তঞ্চঙ্গ্যা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন যার উপর প্রযোজ্য নয়ঃ-**

ক) যদি তিনি ঘোষণা দিয়ে আচার-আচরণে তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিতি ত্যাগ করেন;

খ) তঞ্চঙ্গ্যা কোনো পুরুষ বা মহিলা ধর্মান্তরিত ও জাতিচ্যুত হয়ে ভিন্ন জনগোষ্ঠী হতে স্ত্রী বা স্বামী গ্রহণ করেন এবং তঞ্চঙ্গ্যা সামাজিক রীতিনীতি ও প্রচলিত প্রথা পরিহার করেন।

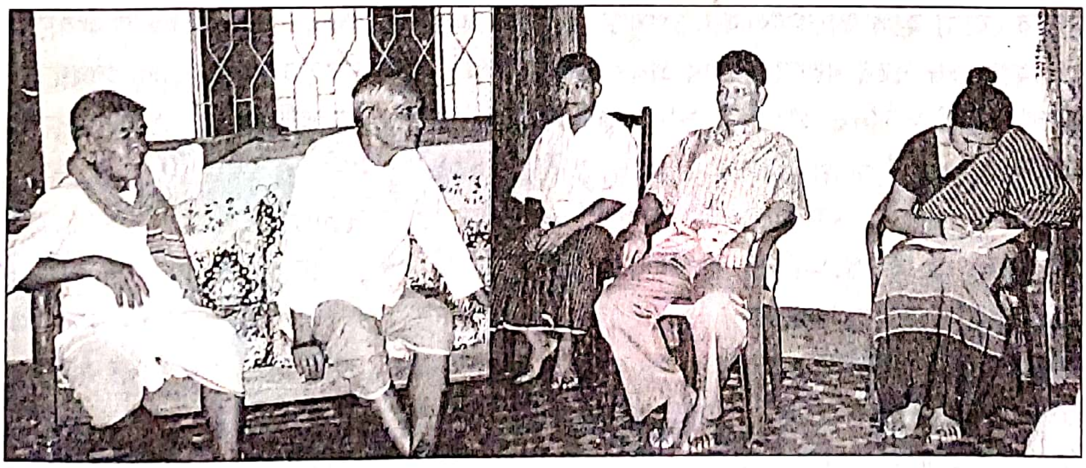

তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর গ্রামীণ সমাজের নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম

Scanned with OKEN Scanner

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বিবাহ (সাঙা)

৩.১ **বিবাহের সংজ্ঞাঃ** তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে বিবাহ হলো একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে স্বীকৃত বিবাহের পূর্বশর্ত হচ্ছে 'চুমুলাঙ' পুজা অনুষ্ঠান। এই সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবাহিত তঞ্চঙ্গ্যা দম্পতি একত্রে বসবাস ও জৈবিক মিলনের মাধ্যমে সন্তান জন্মদানের অধিকার লাভ করে। এই সামাজিক রীতি অনুসরণ ব্যতীত তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে নর-নারীর জৈবিক মিলন, একত্রে বসবাস ও সন্তান জন্মদান সমাজসিদ্ধ নয় বিধায় সেই সন্তান আইনতঃ অবৈধ বলে গণ্য হবে। সমাজসিদ্ধ বিবাহের ক্ষেত্রে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে ধর্মীয় কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হলেও চুমুলাঙ পূজার সাথে ধর্মীয় বিশ্বাসের কোনো প্রকার সম্পর্ক নেই। এটি প্রকৃতির প্রতি আনুগত্য থেকে উদ্ভূত সামাজিক বিশ্বাসপ্রসূত একটি প্রথা। পরিবারের সংকট বা বিপদ-আপদ হতে মুক্তি, প্রসুতির নিরাপদ সন্তান প্রসব অথবা পুত্র কিংবা কন্যা সন্তান কামনা করেও 'চুমুলাঙ' পুজা করা হয়।

৩.২ **বিবাহের যোগ্যতাঃ** তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্য পাত্র-পাত্রীর বেলায় সুনির্দিষ্ট কোনো বয়সসীমা বা কোনো প্রকার সুনির্দিষ্ট যোগ্যতার মাপকাঠি নেই। তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা অনুসারে বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীকে (১) সাবালক বা প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে, (২) শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে, (৩) শারীরিক অসামর্থ্য যেমনঃ- কানা, বোবা, খোঁড়া নর-নারী অবশ্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে যদি বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী উভয়ের বিয়েতে সম্মতি থাকে। তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে সাবালকত্ব অর্জনের মাপকাঠি সমাজের অনুমান বা ধারণার ওপর সচরাচর নির্ভরশীল। সাধারণতঃ পাত্র নিজের শ্রম দ্বারা বা উপার্জনের মাধ্যমে স্ত্রীকে ভরন-পোষণ দেবার সামর্থ্যবান হলে তার বিয়ের উপযুক্ত বয়স হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়। পাত্রীর বেলায় রজঃপ্রবৃত্তি হওয়া এবং ঘরকন্না ও বুনন বা জুমচাষে কাজ করার যোগ্য হলে তাকে বিয়ের উপযুক্ত বিবেচনা করা হয়। তঞ্চঙ্গ্যাদের গ্রামীণ সমাজে ১৫ হতে ১৮ বছর বয়সে বিয়ের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তবে সমাজে বাল্য বিবাহের প্রচলন নেই। যদিও প্রচলিত সাবালকত্ব আইন ১৮৭৫[২২], অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন ১৮৯০[২৩], বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯[২৪], নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০[২৫], বাংলাদেশের সকল সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর উপর সমানভাবে প্রযোজ্য। এ সকল আইনে অপরিণত বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ১৯২৯ সনের বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনের ২(ক) ও ২(খ) ধারায় শিশু ও বালক বলতে যার বয়স পুরুষ হলে ২১ বছরের কম এবং নারী হলে ১৮ বছরের কম। তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত কম বয়সের বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে দেশের বিদ্যমান আদালতে যদি কোনো কারণে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এবং যদি প্রমাণিত হয় যে বিবাহিত পক্ষগণ নাবালক, তাহলে তঞ্চঙ্গ্যা সামাজিক প্রথামতে নাবালকের বিবাহ কার্য

Scanned with OKEN Scanner

সমাজসিদ্ধ হলেও তার কোনো প্রকার আইনগত বৈধতা থাকবে না, বরঞ্চ তা শাস্তি যোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

৩.৩ **তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ সম্পর্ক (অসাঙা সম্পর্ক)ঃ** তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে নিম্নবর্ণিত আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনকে নিষিদ্ধ বলে গণ্য করা হয়।

(ক) একই গোত্রের যে কোনো আত্মীয়ের মধ্যে গোত্র বিশেষে- তিন পুরুষ অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত;
(খ) মামা-ভাগ্নীর মধ্যে;
(গ) পিসি-ভাইপোর মধ্যে;
(ঘ) স্ত্রীর আপন বড় বোনের সাথে;
(ঙ) কাকা-ভাইঝির মধ্যে;
(চ) মাসী-ভাগিনার মধ্যে;
(ছ) বিমাতার সঙ্গে;
(জ) একই পিতার ঔরসে ভিন্ন ভিন্ন মাতার গর্ভজাত ছেলে-মেয়ের মধ্যে (সৎ ভাই-বোনের মধ্যে);
(ঝ) ভ্রাতুষ্পুত্রের স্ত্রীর সঙ্গে;
(ঞ) ভাগিনার স্ত্রীর সঙ্গে;
(ট) মামী সম্পর্কীয় আত্মীয়ার সাথে;
(ঠ) কাকী সম্পর্কীয় আত্মীয়ার সাথে;
(ড) তালতো ভাইয়ের সাথে আপন কন্যার;
(ঢ) দত্তক পুত্র-কন্যার সাথে আপন পুত্র-কন্যার।

৩.৪ **বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের কতিপয় অনুসরণীয়/পালনীয় রীতিনীতিঃ-**

(ক) সাধারণভাবে একজন তঞ্চঙ্গ্যা পুরুষ একজন তঞ্চঙ্গ্যা মহিলাকে বিবাহ করবে।
(খ) পাত্র-পাত্রীকে বিবাহ নিষিদ্ধ সম্পর্কের আওতা বহির্ভূত হতে হবে।
(গ) পাত্র-পাত্রীকে রক্ত সম্পর্কজনিত বিধি নিষেধ মেনে বিয়ে করতে হবে।
(ঘ) পাত্র-পাত্রীকে সাবালকত্ব অর্জন করতে হবে।
(ঙ) পাত্র-পাত্রীকে জোড়া বন্ধন (ল্লাত্তংবানা/ফং গরানা) সম্পন্ন করতে হবে।

৩.৫ **বিবাহের প্রকারভেদঃ** তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে সচরাচর দুই ধরণের বিবাহের অস্তিত্ব রয়েছে। যথাঃ-

(ক) সামাজিক/নিয়মিত বিবাহ (খ) পলায়ন/অনিয়মিত বিবাহ। আধুনিক ও শিক্ষিত সমাজে কোর্ট ম্যারেজ ও মিশ্র বিবাহের কিছু প্রবণতা ইদানিং দেখা গেলেও সামাজিক রীতি ও প্রথা অনুসারে সমাজসিদ্ধ করা ব্যতিরেকে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজ তা অনুমোদন করে না। রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহিত দম্পতিকে সমাজচ্যূত করা হয়। বিধবা বিবাহ ও বহু বিবাহের প্রচলন আছে।

Scanned with OKEN Scanner

৩.৬ **সামাজিক/নিয়মিত বিবাহঃ** পাত্র-পাত্রীর পিতা-মাতা কিংবা অভিভাবকেরা সমাজসিদ্ধ রীতিতে বিবাহের সম্বন্ধ ধার্য করেন অথবা পাত্র-পাত্রী পরস্পর পরস্পরকে পছন্দের মাধ্যমে অভিভাবকের সম্মতিক্রমে সামাজিক নিয়ম অনুসরণ করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় বলে এ বিয়ে সামাজিক/নিয়মিত বিবাহ হিসেবে স্বীকৃত। তঞ্চঙ্গ্যা সামাজিক/নিয়মিত বিবাহ কয়েক পর্বের আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। সামাজিক/নিয়মিত বিবাহ আবার দুই প্রকারে হয়। যথাঃ- (ক) প্রথাসিদ্ধ বিবাহ (খ) ঘরজামাই তুলে বিয়ে।

(ক) **প্রথাসিদ্ধ (সামাজিক/নিয়মিত বিবাহ) বিবাহঃ** তঞ্চঙ্গ্যা সামাজিক/নিয়মিত বিবাহ বহুবিধ আনুষ্ঠানিকতায় আড়ম্বরপূর্ণ হয়ে থাকে। এতে তেম্মাং (শলাপরামর্শ), বউ পূছা গারানা, দাভা, সাজনী বা বোয়ালী সামগ্রী, বউ খজা যানা, জামাই তুলা, ল্লাত্তংবানা বা ফং গরানা, চুমুলাঙ পূজা, সেফ মাগানা, খানা সিরানা, বউ তুলানা, সেফ মাগা যানা প্রভৃতি আচার-অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। পাত্র-পাত্রী ও পাত্র-পাত্রীর পিতা-মাতার সম্মতি অনুসারে এবং সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানাদি বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণের মাধ্যমে এ বিয়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে বলে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে এরূপ বিবাহের প্রচলন বেশী।

(খ) **ঘরজামাই তুলে বিয়েঃ** পাত্রকে ঘরজামাই তুলে মেয়ে বিয়ে দেবার নিয়মও তঞ্চঙ্গ্যা সামাজিক/নিয়মিত বিবাহ হিসেবে স্বীকৃত। তবে এ ধরণের বিবাহে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান হয় না এবং কনের পিতা বরের কাছে কোনো দাভা ও সাজনী দাবী করে না। কনের বাপের বাড়িতে পাত্রকে ঘরজামাই তোলার পর সামাজিক নিয়মানুসারে চুমুলাঙ, ফং গরানা, খানা সিরানা এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাধারণতঃ পুত্র সন্তান না থাকা কিংবা সংসারে কাজ-কর্মের প্রয়োজনে ঘরজামাই তোলা হয়। এক্ষেত্রে অনেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঘরজামাই থাকার পর বউ নিয়ে নিজ বাড়িতে ফিরে যায়; আবার অনেকে সারাজীবন ঘরজামাই থেকে শ্বশুরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়।

৩.৭ **সামাজিক/নিয়মিত বিবাহের আইনগত ফলাফলঃ** সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি অনুসরণ করে বিবাহিত একজন পুরুষ (যুবক) এবং একজন মহিলা (যুবতী) উভয়ে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একত্রে বসবাস করার সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে, যা তঞ্চঙ্গ্যা বিবাহ প্রথা অনুযায়ী সমাজসিদ্ধ। বিবাহিত দম্পতির দৈহিক মিলনের ফলে যে সন্তান জন্ম লাভ করবে, সে বৈধ সন্তানও পিতা-মাতার উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য হবে।

স্বামী-স্ত্রী হিসেবে তাদের একজনের উপর অপরজনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, একজনের ভাল-মন্দ দেখার দায়িত্ব অপরজনের উপর বর্তাবে। স্ত্রী তার স্বামীর নিকট হতে ভরন-পোষণ, সামাজিক মর্যাদা ও স্বামীর পারিবারিক পদবীর অধিকারী হবে।

৩.৮ **পলায়ন/অনিয়মিত বিবাহঃ** তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে পলায়ন/অনিয়মিত বিবাহ দুই রকমের হয়ে থাকে। যথাঃ- (ক) ছিনালী সাঙা (বিবাহ) (খ) বউ ঘরে উঠে বিবাহ।

Scanned with OKEN Scanner

ক. **ছিনালী সাঙাঃ** যুবক-যুবতী উভয়ের মনোমিলনে এবং তাদের বা অভিভাবকের অসম্মতি কিংবা এক পক্ষের অসম্মতির কারণে প্রচলিত নিয়মের বাইরে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে নিজেদেরকে স্বামী-স্ত্রী রূপে গ্রহণ করাকে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে পলায়ন/অনিয়মিত বিবাহ (ছিনালী সাঙা) বলা হয়। যুবক-যুবতীকে পালিয়ে গিয়ে কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়। পরদিন সেই আত্মীয়ের মাধ্যমে যুবক-যুবতীর পিতা-মাতাকে খবর পৌঁছাতে হয়। খবর অনুসারে যুবকের পক্ষ হতে যুবতীর বাড়িতে ১টি সিদ্ধ মোরগ ও ১ বোতল মদসহ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে (পৈ-গছানো) যেতে হয়। মেয়েপক্ষ বিয়েতে সম্মত হলে 'পৈ' গ্রহণ করে, নয়তো বিয়ে হয় না। সেক্ষেত্রে যুবক-যুবতীকে স্থানীয় হেডম্যান বা কার্বারীর নিকট উপস্থিত হতে হয়। সামাজিক আদালতের শালিসী বৈঠকে যুবতীর বাবা বিয়েতে অসম্মত হলে মেয়েকে ফেরৎ নিতে পারেন। এভাবে তিনবার পর্যন্ত কন্যাকে নিজ হেফাজতে নেবার অধিকার তিনি রাখেন। চতুর্থবার কন্যা পালিয়ে গেলে পিতা তার কন্যার ওপর আর কোনোরূপ কর্তৃত্ব দাবী করতে পারেন না তখন উক্ত যুবকের সাথেই বিয়ে দিতে বাধ্য হন। ছিনালী সাঙার অনুষ্ঠান অনাড়ম্বরভাবে কনের বাপের বাড়িতে হয়। যুবককে কেবলমাত্র যুবতীর বাবা-মায়ের কাছে 'পৈ' গছিয়ে আশীর্বাদ গ্রহণের মাধ্যমে এ বিয়ে হয়। অবশ্য পৈ গ্রহণের আগে মেয়ের বাবা ছেলের কাছে নিজ ইচ্ছা অনুসারে দাভা বা কনে পণ দাবী করতে পারেন। মেয়ের মাও ৭ টাকা পর্যন্ত দুধলী টাকা দাবী করতে পারেন। এরূপ বিয়েতে যুবককে ৭৫% টাকা ও যুবতীকে ২৫% হারে টাকা সমাজের কাছে জরিমানা দিয়ে একটি শুকর কিনে পাড়া প্রতিবেশীকে খাওয়াতে হয়। তবে পাত্র-পাত্রীর তিনবার পর্যন্ত পালিয়ে যাবার বেলায় সামাজিক আদালতে এ ধরণের জরিমানা দিতে হয়, চতুর্থবারে দিতে হয় না।

খ. **বউ ঘরে উঠে বিবাহঃ** পাত্রের পিতা-মাতা বা অভিভাবক যদি অনিয়মিত বিবাহে তাদের সম্মতি দেয়, সেক্ষেত্রে পাত্রীকে খুব ভোরে এক কলসী পানি নিয়ে প্রেমিকের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সকালে বাড়ির লোকজন দরজা খোলা মাত্র অপেক্ষমান পাত্রী ভরা কলসী নিয়ে বউ হিসেবে বাড়িতে প্রবেশ করে। পাত্রীর এ ধরণের গৃহ প্রবেশকে লক্ষ্মী এসেছে বলে মনে করা হয়। সামাজিক নিয়মানুসারে আচার-অনুষ্ঠানাদিসহ পাত্রের বাড়িতেই বিয়ের আয়োজন করা হয়।

৩.৯ **কোর্ট ম্যারেজঃ** কোর্ট ম্যারেজ মূলতঃ আদালতের কোনো প্রকার আদেশ নয়। আধুনিক তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে ইদানিং পরিবারের অসম্মতিতে বিবাহে ইচ্ছুক পাত্র-পাত্রী উভয়ে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট অথবা নোটারী পাবলিক এর সম্মুখে নিজেদেরকে আইনতঃ স্বামী-স্ত্রী হিসেবে শপথ পূর্বক ঘোষণা প্রদানের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে বলা চলে প্রাচীনকালের মনোমিলনে পলায়ন বিবাহের আধুনিক সংস্করণ হচ্ছে কোর্ট ম্যারেজ, যদিও এটি নিছক একটি শপথনামা মাত্র। তাই এ বিবাহ অলঙ্ঘনীয়ও নয়। তবে বিবাহিত পাত্র-পাত্রী এক্ষেত্রে সাবালক হলেও নিষিদ্ধ

Scanned with OKEN Scanner

সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয় হলে সম্পাদিত কোর্ট ম্যারেজ সামাজিকভাবে বৈধ হবে না। সর্বোপরি এ ধরণের কোর্ট ম্যারেজ প্রথাসিদ্ধ নয়, তা অসামাজিক বিবাহ।

৩.১০ <u>ব্যাখ্যাঃ</u> মূলতঃ কোর্টে কোনো বিবাহ হয় না। পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত পাত্র-পাত্রীকে স্বেচ্ছায় কোর্টে আসার পূর্বে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। পরে কোর্টে এসে উভয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে এই প্রকার Love Marriage এর সমর্থনে একটি শপথ সম্বলিত বিবৃতি Affidavit দেয় এবং এভাবে বিবাহের সমর্থনে একটি দলিল সৃষ্টি করে। কার্যতঃ এই প্রকার শপথ সম্বলিত বিবৃতি অর্থাৎ এফিডেবিটের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

"অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসবর্ণে প্রণয়ঘটিত বিবাহগুলো উভয়পক্ষের অভিভাবকদের অসম্মতিতে হয়ে থাকে। এরূপ বিবাহিত দম্পতিকে বিবাহের অব্যবহিত পরেই কোর্টে গিয়ে তাদের বিবাহের সমর্থনে একটি দলিল সৃষ্টি করতে হয়, যাতে যে কোনো পক্ষের অভিভাবকের উদ্যোগে থানায় অথবা কোর্টে তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের হলে এই দলিল তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনে সহায়ক হয়"। **(সূত্রঃ- হিন্দু আইনের ভাষ্যঃ গাজী শামছুর রহমান)**

পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে তঞ্চঙ্গ্যা যুবক-যুবতী কোর্টে আসার আগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। কোর্টে এসে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে 'আমরা পরস্পরকে বিবাহ করলাম' মর্মে বিবৃতি (হলফনামা) সম্পাদন করে দেয়। অর্থাৎ তারা কোর্টেই একে অপরকে বিয়ের ঘোষণা দেয় মাত্র। কোর্টে আসার আগে বিয়ে করেনি। আগেই বলা হয়েছে যে, কোর্টে কোনো বিয়ে হয় না। পূর্বে সম্পন্ন হওয়া বিয়ের ঘোষণা কোর্টে এসে দেয়া যায় মাত্র। সুতরাং যুবক-যুবতী উভয়ে হলফনামার মাধ্যমে বিয়ে হয়েছে বলে যা বুঝাতে চায়, তা মোটেই সমাজসিদ্ধ বিয়ে নয়। তঞ্চঙ্গ্যা সমাজসিদ্ধ বিবাহের পূর্ব শর্ত হচ্ছে 'ল্লাত্তংবানা' বা 'ফং গরানা' অনুষ্ঠান সম্পাদন করা।

৩.১১ <u>মিশ্র বিবাহঃ</u> পার্বত্য জেলাসমূহে বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠী ছাড়াও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে উভয়পক্ষের সম্মতিতে 'চুমুলাঙ, ফং গরানা, খানা সিরানা' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া মিশ্র বিবাহকে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে স্বীকৃত বিবাহ রূপে গণ্য হয়। এরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে কনে যে জনগোষ্ঠী হতে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে এসেছে সেই পিতৃকুলের ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, মর্যাদা, পদবী তার লোপ পাবে এবং স্ত্রী হিসেবে তঞ্চঙ্গ্যা স্বামীর ধর্মীয় বিশ্বাস, বর্ণ, গোত্র, মর্যাদা, পদবী ধারণ করবে। অনুরূপভাবে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের কোনো মেয়ের সাথে অন্য জনগোষ্ঠীর পুরুষের বিবাহ হলে এবং ধর্মান্তরিত হয়ে অন্য জনগোষ্ঠীভূক্ত হলে সেই বিবাহিত মহিলা তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের উত্তরাধিকারসহ পদ ও পদবী হারাবে।

৩.১২ <u>পলায়ন/অনিয়মিত বিবাহের (পালিয়ে গিয়ে গোপনে বিয়ে করা) আইনগত ফলাফলঃ</u> পলায়নের পর প্রেমিক-প্রেমিকাকে সামাজিক আদালতে বিচারের সম্মুখীন

Scanned with OKEN Scanner

হতে হয়। যদি প্রেমিকের সাথে মেয়ের অভিভাবক তার মেয়েকে বিয়ে দিতে রাজী না হয় কিংবা প্রেমিকের অভিভাবক যদি প্রেমিকার পিতা-মাতার কনেপণ ও অন্যান্য দাবী পূরণ করতে রাজী বা সমর্থ না হয়, তাহলে পলাতক যুগলের বিয়ে হবে না এবং প্রেমিকাকে তার পিতার বাড়ীতে ফিরে যেতে হবে।

প্রেমিক-প্রেমিকা এভাবে পলায়নের কারণে সামাজিক বিচারে জোর করে অপহরণ করার অভিযোগে প্রেমিককে অপরাধী সাব্যস্ত করা না হলে এবং প্রেমিকার পিতা-মাতা সেই পাত্রের সাথে বিয়ে দিতে রাজি হলেও পলাতক অবস্থায় উভয়ের বিবাহ বহির্ভূতভাবে দৈহিক মিলনের সামাজিক অপরাধের জন্য সাজাভোগ করতে হবে যেমনঃ- শুকর, মোরগ, মদ ও নগদ টাকা জরিমানা প্রদান সাপেক্ষে প্রেমিক-প্রেমিকার বিয়ে হলে সেটা সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত বলে গণ্য হবে। সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত হলে প্রেমিক-প্রেমিকার বিবাহ বহির্ভূত দৈহিক মিলনের দ্বারা জন্মগ্রহণকারী সেই সন্তানও বৈধ সন্তান হিসেবে গণ্য হবে এবং পিতা-মাতার উত্তরাধিকারী হয়ে পূর্ণ সামাজিক মর্যাদা ভোগ করবে।

প্রেমিক বা প্রেমিকার পিতা-মাতার অসম্মতির কারণে প্রেমিক যুগলের বিয়ে না হয়ে যদি পলাতক অবস্থায় উভয়ের দৈহিক মিলনের কারণে প্রেমিকা গর্ভবতী হয়, তাহলে ভূমিষ্ট সেই সন্তান অবৈধ সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। তবে সন্তান যার ঔরসে জন্মলাভ করেছে/করবে সেই পিতার উত্তরাধিকারী হবে।

৩.১৩ <u>দেশের প্রচলিত আইনে আদালতে মামলা ও সাজা হওয়ার আশংকাঃ</u> প্রেমিক-প্রেমিকার বিয়েতে তাদের অভিভাবকের সম্মতি না থাকলে পলায়নের খবর জানাজানি হবার পর প্রেমিকার পিতা প্রেমিকের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর আওতায় মামলা দায়ের করতে পারে। আদালতে এ ধরণের মামলার ফলে প্রেমিক গ্রেপ্তার ও বিচারে সাজা পাবে। আর প্রেমিকা যদি নাবালিকা হয় অথবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপহরণ ও দৈহিক মিলনে বাধ্য করা হয়েছে বলে সে আদালতে জবানবন্দি দেয়, তাহলে প্রেমিকের ১৪ বছর থেকে যাবজ্জীবন পর্যন্ত কারাদন্ড হতে পারে।

৩.১৪ <u>অসাঙ্যা/নিষিদ্ধ বা অননুমোদিত বিবাহঃ</u> তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে রক্ত সম্পর্কীয় (তিন পুরুষ অতিক্রান্ত না হলে) নিকটাত্মীয়ের মধ্যে (অসাঙ্যা সম্পর্ক) বিবাহ নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ সম্পর্কের আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ হলে তা অবৈধ বিবাহ হিসেবে গণ্য হয় এবং তাদের সন্তান অবৈধ সন্তান হিসেবে সমাজে পরিচিত হয়। এ ধরণের বিবাহের ক্ষেত্রে তঞ্চঙ্গ্যা সামাজিক বিচারে ছিনালী অপরাধে শাস্তি দেয়া হয় এবং সংশ্লিষ্ট দম্পতিকে ছাড়াছাড়ি করে দেয়া (বিচ্ছেদ ঘটানো) হয়। নিষিদ্ধ বা অবৈধ দম্পতিকে, এরূপ বিবাহে সাহায্যকারী ব্যক্তি এবং বিবাহ সম্পাদনকারী ওঝা সকলকেই সামাজিক আদালতে দোষী সাব্যস্ত করে অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হয়। তা সত্বেও নিষিদ্ধ বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ দম্পতি যদি দাম্পত্য জীবন অক্ষুন্ন রাখে, তাহলে উভয়কে সমাজচ্যুত হিসেবে একঘরে করা হয়। নতুবা দম্পতিকে সমাজের দাবী পূরণ করে সমাজভূক্ত হতে হয়।

Scanned with OKEN Scanner

৩.১৫ অসাঙ্যা/নিষিদ্ধ বা অননুমোদিত বিবাহের আইনগত ফলাফলঃ তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের প্রথা অনুসারে নিষিদ্ধ সম্পর্কের আত্মীয়ের সাথে বিয়ের অপরাধের জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ অপরিহার্য এবং শাস্তিস্বরূপ শুকর জরিমানা দিতে হয়। গোপনে বিয়ে করে সামাজিক স্বীকৃতি ছাড়া স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করার অপরাধের শাস্তি হচ্ছে অর্থদন্ড। এরপরেও উক্ত দম্পত্তি যদি দাম্পত্য জীবন অক্ষুন্ন রাখে তবে সমাজচ্যূত করে তাদেরকে 'এক ঘরে' করা হয়। এরূপ দম্পতিকে সমাজে গ্রহণ করতে হলে যুবককে বৌদ্ধ ধর্মীয় রীতি অনুসারে শ্রমণ হতে হয় এবং যুবতীকে বাপের বাড়িতে ফিরে গিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুর কাছে মঙ্গলসূত্র শুনে শুদ্ধ হতে হয়। তারপর উভয়কে সমাজে গ্রহণ করা হয়।

৩.১৬ ব্যাখ্যাঃ নিষিদ্ধ সম্পর্কের আত্মীয়ের সাথে বিয়ে হওয়া সমাজে একেবারে বিরল ঘটনা নয়। অতীতে যেমন ছিল, বর্তমানেও এ ধরণের কিছু কিছু বিয়ের নজির খুঁজে পাওয়া যায়। সামাজিক রীতি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত বিয়ের বৈধতা বা অস্তিত্ব নিয়ে সাধারণতঃ কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না। তবে পালিয়ে গিয়ে 'চুমুলাং, ল্লাত্তংবানা/ফং গরানা' ছাড়া বিয়ে করার পর ভিন্ন এলাকায় স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাসকালে স্বামী বা স্ত্রী যে কোনো একজন যদি বিয়ের কথা অস্বীকার করে তখন বিয়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। সচরাচর তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে এমন ঘটনা ঘটে না।

৩.১৭ বিধবা বিবাহঃ তঞ্চঙ্গ্যা সামাজিক প্রথামতে বিধবা বিবাহ অনুমোদিত। একজন বিপত্নীক যেমন বিয়ে করতে পারে, তেমনি একজন বিধবা মহিলাও বিয়ে করতে পারে। একজন বিধবা যদি তার স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তান-সন্ততিসহ স্বামীর পরিবারে বা শ্বশুর-শ্বাশুড়ির সাথে একত্রে বসবাস করে তাহলে স্বামীর সম্পত্তি থেকে উক্ত বিধবা আমৃত্যু ভরন-পোষণ পাবার অধিকারী। কিন্তু দ্বিতীয়বার বিয়ে করে যদি স্বামী-শ্বশুরের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে স্বামীর সম্পত্তি থেকে ভরন-পোষণ পাবে না। তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে একজন বিধবার দ্বিতীয় বিবাহ সামাজিকভাবে প্রথাসিদ্ধ। তবে মহিলার দ্বিতীয় বিবাহ কার্যটি নিজ পিতার বা ভাইয়ের বাড়িতে থেকে সম্পন্ন করতে হবে।

৩.১৮ বহু বিবাহঃ তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে বহু বিবাহ স্বীকৃত। তবে একজন বিবাহিত তঞ্চঙ্গ্যা স্বামী তার স্ত্রীর জীবদ্দশায় স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন না করে স্ত্রীর সম্মতিতে নিম্নোক্ত কারণে বহু বিবাহে আবদ্ধ হতে পারেনঃ-

(ক) সন্তানহীন দম্পতির বংশ রক্ষার তাগিদে;
(খ) স্ত্রী দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে;
(গ) স্ত্রী উন্মাদ বা অপ্রকৃতিস্থ হলে;
(ঘ) স্ত্রী শারীরিক পক্ষাঘাতগ্রস্থ হলে;
(ঙ) স্ত্রীর অনুমতি বা সম্মতি সাপেক্ষে;
(চ) স্ত্রী যদি কোনো কারণে স্বামীর অমতে দীর্ঘ বৎসর পিত্রালয়ে বা দেশান্তরে থাকে;
(ছ) স্ত্রী যদি ব্যাভিচারে কিংবা পরকীয়াতে লিপ্ত হয় এবং এ ধরণের অপরাধে সামাজিক আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়।

Scanned with OKEN Scanner

৩.১৯ **মন্তব্যঃ** বহু বিবাহ বলতে প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকা অবস্থায় আরও এক বা একাধিক মহিলাকে বিয়ে করা বুঝায়। প্রথম স্ত্রী মারা গেলে বা প্রথম স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে সব সমাজেই দ্বিতীয়বার বিয়ে করার রীতি আছে।

৩.২০ **বহু বিবাহের আইনগত ফলাফলঃ** তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে বহু বিবাহ অনুমোদিত নয়, তবে ইদানিংকালে হচ্ছে। কোনো তঞ্চঙ্গ্যা ব্যক্তি একাধিক মহিলাকে বিয়ে করলেও সমাজ তাতে মাথা ঘামায় না। কারণ একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকার ফলে পরিবারে যে অশান্তির সৃষ্টি হয়, তার প্রভাব সমাজে খুব একটা পড়ে না। পরিবারের লোকজন, বিশেষতঃ স্ত্রীরাই সেই অশান্তি ভোগ করে। প্রতিবাদ বা আপত্তি এলে তা ভূক্তভোগী স্ত্রীর কাছ থেকেই আসার কথা। পুরুষ শাসিত সমাজে এ ধরণের বিয়েতে স্ত্রীদের আপত্তি কিংবা প্রতিবাদ করার সুযোগ তেমন নেই বললে চলে। অবশ্য উপরোক্ত (ঙ)নং শর্ত ব্যতীত অবশিষ্ট ৬টি কারণেও যদি দ্বিতীয়বার বিবাহে স্বামী তার স্ত্রীর অনুমতি বা সম্মতি গ্রহণ না করে তবে বাংলাদেশ দন্ডবিধি ৪৯৪ ও ৪৯৫ ধারামতে তা দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। সেক্ষেত্রে সমাজে প্রচলিত বিধান অকার্যকর গণ্য হবে এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে ৭ হতে ১০ বছর কারাদন্ড হতে পারে।

৩.২১ **মন্তব্যঃ** তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে একাধিক বিয়ে করা যায়। কোনো তঞ্চঙ্গ্যা স্বামীর একাধিক বিয়ের কারণে স্ত্রী দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করলে স্বামীর শাস্তি হতে পারে। সেই বিচার অবশ্য তঞ্চঙ্গ্যা সমাজসম্মত নয়। বর্তমানে প্রচলিত কোনো প্রথা দ্বারা সমাজের বৃহত্তর অংশের ক্ষতিসাধিত হলে তা অবশ্যই সংশোধন করা যায়। এক্ষেত্রে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের বিচার কাঠামোর বাইরে গিয়ে প্রতিকার চাওয়া এবং তঞ্চঙ্গ্যা প্রথাগত আইন মেনে চলা এক নয়।

৩.২২ **বিবাহের প্রমাণঃ** তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে বিয়ে নিবন্ধনের কোনো রীতি নেই। এমনকি বিয়ের প্রমাণ স্বরূপ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো লিখিত দলিলও তৈরি করা হয় না। তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে বিবাহ একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। তবে সাধারণতঃ বিবাহের পদ্ধতি বা রীতিনীতির বিষয়ে সামাজিক ও আইনগত বৈধতার প্রশ্নে কোনো প্রকার সমস্যার উদ্ভব হলে সেক্ষেত্রে বিবাহের সত্যতা বা অস্তিত্ব প্রমাণ হয় নিম্নমতেঃ-

(ক) বিয়ের অনুষ্ঠানে (ভোজে) উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের মৌখিক সাক্ষ্য;
(খ) সমাজপতি যথাঃ- রাজা, হেডম্যান, কার্বারী প্রদত্ত সনদপত্র;
(গ) জোড়া বন্ধন (ল্লাত্তংবানা/ফং গরানা) পরিচালনাকারী মৃতে ছ্রা, উবদিদাই বা বৌদ্ধ ভিক্ষুর সাক্ষী;
(ঘ) বিয়ের শপথনামা (যদি থাকে);
(ঙ) সমাজ স্বীকৃতভাবে স্বামী ও স্ত্রী হিসেবে একত্রে বসবাস;
(চ) স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পরস্পর পরস্পরকে স্বীকৃতি প্রদান;
(ছ) স্ত্রীর গর্ভে স্বামীর ঔরসজাত সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার;
(জ) স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বাবা-মায়ের স্বীকৃতি;

Scanned with OKEN Scanner

(ঝ) ল্লাত্তংবানা বা ফং গরানা অনুষ্ঠানের প্রামাণ্য ছবি।

উপরোক্ত উপাদানগুলো বিয়ের অস্তিত্ব সরাসরি প্রমাণ করবে।

৩.২৩ ব্যাখ্যাঃ একজোড়া নারী-পুরুষ স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস করেছে এরূপ প্রমাণ থাকলেই, যতক্ষণ না বিপরীত কিছু স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, বৈধ বৈবাহিক অবস্থায় তারা বসবাস করছে বলে আইন ধরে নিবে।

৩.২৪ বৈবাহিক কর্তব্যঃ-

(ক) স্ত্রী তার স্বামীর সাথে বসবাস করবে এবং স্বামীর ন্যায়সঙ্গত নির্দেশ ও পরামর্শ মেনে চলবে।

(খ) স্বামী তার স্ত্রীর সাথে বসবাস করতে ও স্ত্রীর ভরন-পোষণ দিতে বাধ্য।

(গ) উভয় সাংসারিক ও পারিবারিক দায়-দ্বায়িত্ব নিষ্ঠাবান থাকবেন।

৩.২৫ আইনসঙ্গত বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার এবং দায়িত্বঃ-

(ক) বিয়ের সময় যদি স্ত্রী নাবালিকা থাকে তবে নাবালিকা স্ত্রীর ওপর সাবালক স্বামীর অভিভাবকত্ব বর্তায়। এক্ষেত্রে নাবালিকার পিতা-মাতার চেয়েও স্বামীর দাবী অগ্রগণ্য।

(খ) বিয়ের পর স্ত্রীকে অবশ্যই স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী নির্ধারিত স্থানে স্বামীর সাথে বসবাস করতে হবে এবং স্বামীর সকল প্রকার ন্যায়সঙ্গত নির্দেশ অনুযায়ী চলতে হবে। অনুরূপভাবে স্বামীকেও স্ত্রীর মর্যাদায় স্ত্রীকে তার সাথে রাখতে হবে এবং পারিবারিক মর্যাদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী ভরন-পোষণ দিতে বাধ্য থাকবে।

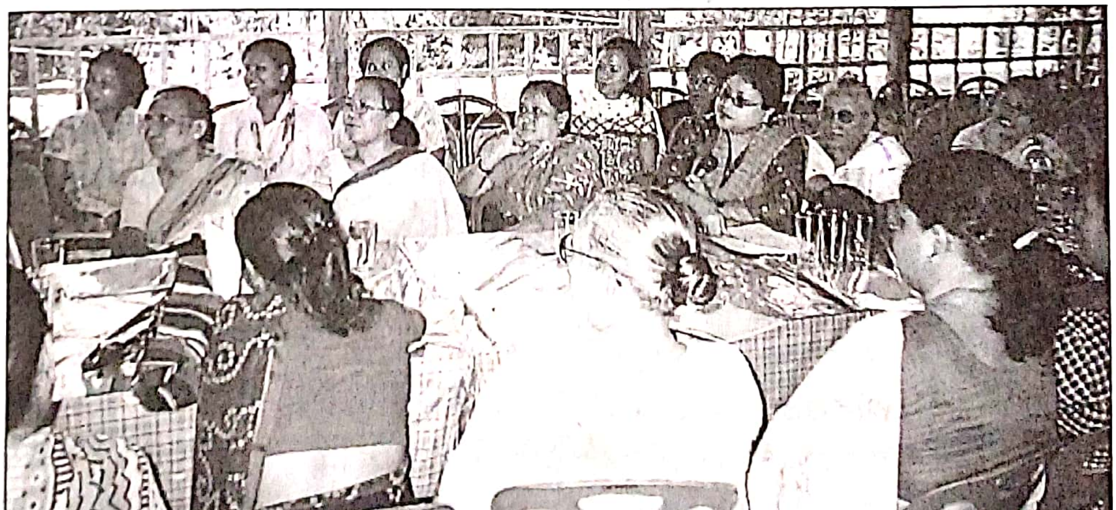

আদিবাসী নারী নেত্রীদের সাথে গোল টেবিল আলোচনা

Scanned with OKEN Scanner

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবাহ বিচ্ছেদ (ছাড়াছাড়ি)

৪.১ **বিবাহ বিচ্ছেদঃ** তঞ্চঙ্গ্যা পরিবারে স্বামী ও স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করাকে 'ছাড়াছাড়ি' বলা হয়।

৪.২ **বিবাহ বিচ্ছেদের বিভিন্ন পদ্ধতিঃ** স্বামী কিংবা স্ত্রী যে কোনো একজনের মৃত্যুতে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজ স্বীকৃত একটি দাম্পত্য জীবন তথা বিবাহিত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তবে সামাজিক রীতি ও আইন স্বীকৃত উপায়ে নিম্নবর্ণিত কারণে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে জীবদ্দশায় বৈবাহিক সম্পর্কের পরিসমাপ্তি বা 'ছাড়াছাড়ি' হতে পারেঃ-

ক) স্বামী-স্ত্রী উভয়ে স্বেচ্ছায় সামাজিক আদালতের দ্বারস্থ হয়ে সিদ্ধান্তের মাধ্যমে 'ছাড়াছাড়ি' সম্পাদন করতে পারে।

খ) সামাজিক আদালত বা বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমের আওতায় 'ছাড়াছাড়ি' করা যায়।

গ) ইদানিং শিক্ষিত সমাজে স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিক এর নিকট হলফনামা সম্পাদন মূলে 'ছাড়াছাড়ি' প্রদান করতে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে সম্পাদিত হলফনামার কপি একপক্ষ তার নিযুক্ত আইনজীবির মাধ্যমে অপরপক্ষকে প্রদান করে থাকে (যদিও তা সামাজিক প্রথাসিদ্ধ নয়)।

৪.৩ **কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রী 'ছাড়াছাড়ি' দাবী করার অধিকার লাভ করেঃ** নিম্নোক্ত কারণে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে স্বামী বা স্ত্রী 'ছাড়াছাড়ি' প্রদানের অধিকার লাভ করবেঃ-

ক) স্বামী যদি যৌন মিলনে অক্ষম বা পুরুষত্বহীন হন বা স্ত্রী গর্ভধারণে অক্ষম হন, সেক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রী যে কেনো একজন যথোপযুক্ত ডাক্তারী পরীক্ষার সনদপত্র দ্বারা 'ছাড়াছাড়ি' দাবী করতে পারবেন।

খ) স্বামী বা স্ত্রী যদি পরকীয়া কিংবা ব্যভিচারে বা নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে লিপ্ত হয় এবং এ ধরণের অপরাধের জন্য যে কোনো একজন তার সামাজিক আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে অপরজন 'ছাড়াছাড়ি' দাবী করতে পারবেন।

গ) স্ত্রীর সম্মতি বা অনুমতি ব্যতিরেকে স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করলে, সেক্ষেত্রে সতীনের সাথে একত্রে বসবাসে অসম্মত হয়ে প্রথমা স্ত্রী 'ছাড়াছাড়ি' দাবী করতে পারবেন।

ঘ) স্বামী বা স্ত্রী উভয়ের যে কেউ একজন নিরুদ্দেশ হলে এবং বহু বছর যাবৎ উভয়ের মধ্যে কোনো প্রকার দাম্পত্য সম্পর্ক বা পারিবারিক যোগাযোগ না থাকলে, সেক্ষেত্রে যে কোনো একপক্ষ তার সামাজিক আদালতে একতরফাভাবে 'ছাড়াছাড়ি' সম্পাদন পূর্বক দ্বিতীয় বিবাহে আবদ্ধ হতে পারবেন।

Scanned with OKEN Scanner

ঙ) স্বামী বা স্ত্রী যে কোনো একজন মানসিক বিকারগ্রস্ত অথবা বিকৃত রুচির হলে, সেক্ষেত্রে অপর পক্ষ সামাজিক আদালতের মাধ্যমে 'ছাড়াছাড়ি' প্রদান করতে পারবেন।

চ) স্বামী বা স্ত্রী যে কোনো একপক্ষ কৃত জঘন্য অপরাধের জন্য দন্ডিত হয়ে যদি দীর্ঘদিন কারাভোগে থাকে, সেক্ষেত্রে অপরপক্ষ সামাজিক আদালতের মাধ্যমে একতরফাভাবে 'ছাড়াছাড়ি' দাবী করতে পারবেন।

ছ) যদি স্বামী বা স্ত্রী যে কোনো একজন বৌদ্ধ পুরোহিত বা সাধুমা (হ্লুদমা) হয়, সেক্ষেত্রে অপর পক্ষ একতরফাভাবে সামাজিক আদালতের মাধ্যমে 'ছাড়াছাড়ি' সম্পাদন করতে পারবেন।

জ) স্বামী বা স্ত্রী যে কোনো একপক্ষ যদি নিষ্ঠুর প্রকৃতির, অহেতুক সন্দেহ প্রবণ, মাদকাসক্ত, অকর্মণ্য এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনকারী হয়, সেক্ষেত্রে অপরপক্ষ সামাজিক আদালতের মাধ্যমে 'ছাড়াছাড়ি' সম্পাদন করতে পারবেন।

ঝ) স্ত্রী যদি স্বামীর সংসারে প্রাপ্য ভরন-পোষণ, ন্যায্য অধিকার, চিকিৎসা-সেবা ও পারিবারিক মর্যাদাসহ স্ত্রীর অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, সেক্ষেত্রে তার সামাজিক আদালতের মাধ্যমে 'ছাড়াছাড়ি' সম্পাদন করতে পারবেন।

ঞ) স্বামী বা স্ত্রী যে কোনো একপক্ষ যদি অবিশ্বস্ত বা অবাধ্য হয়, পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রতিপালনে অনিচ্ছুক বা উদাসীন হয়, সেক্ষেত্রে অপরপক্ষ তার সামাজিক আদালতের মাধ্যমে 'ছাড়াছাড়ি' প্রদান করতে পারবেন। তবে দোষী সাব্যস্ত পক্ষকে অপরাধ বিবেচনায় প্রথমবারের মতো সংশোধনের সুযোগ প্রদান সাপেক্ষে সামাজিক আদালতের মাধ্যমে 'ছাড়াছাড়ি' প্রদান করতে পারবেন।

৪.৪ <u>বিবাহ বিচ্ছেদের আইনগত ফলাফলঃ-</u>

ক) সমাজ স্বীকৃত পদ্ধতিতে সামাজিক আদালতের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে 'ছাড়াছাড়ি' সম্পাদিত হলে স্বামী-স্ত্রী যে কেউ পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এরূপ বিবাহ বহু বিবাহ হিসেবে গণ্য হবে না।

খ) 'ছাড়াছাড়ি' হবার পর স্বামী বা স্ত্রী এমনকি উভয়ের সম্মতিতে দৈহিক মিলন অবৈধ হবে। এরূপ দৈহিক মিলনজাত সন্তান অবৈধ বা জারজ হিসেবে গণ্য হবে।

গ) স্বামী বা স্ত্রী যে কোনো পক্ষ দ্বারা 'ছাড়াছাড়ি' সম্পাদনের পর পারস্পরিক পূনঃ সমঝোতা ও আস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে পুনরায় দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য 'চুমুলাঙ, ল্লাত্তংবানা, ফং গরানা, খানা সিরানা' এ সকল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক স্বীকৃতি অর্জন করতে হবে। তবে 'ছাড়াছাড়ি' হবার পর উভয়ের যদি অন্যত্র বিবাহ না হয় সেক্ষেত্রেই 'চুমুলাঙ, ল্লাত্তংবানা, ফং গরানা, খানা সিরানা' অনুষ্ঠান সম্ভব হবে।

ঘ) 'ছাড়াছাড়ি' সম্পাদনের পর স্বামী ও স্ত্রী পারস্পরিক অধিকার এবং কর্তৃত্ব হারাবে।

ঙ) 'ছাড়াছাড়ি' সম্পাদনের পর স্ত্রী তার পূর্ব স্বামীর উত্তরাধিকারসহ পারিবারিক পদবী ও মর্যাদা হারাবে।

Scanned with OKEN Scanner

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উত্তরাধিকার

৫.১ **তঞ্চঙ্গ্যা উত্তরাধিকার প্রথার উদ্ভবঃ** পার্বত্য জেলাসমূহে বাসবাসকারী তঞ্চঙ্গ্যা সমাজ ব্যবস্থায় জুম চাষকে অদ্যাবধি তাদের প্রধান পেশা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৪২ বিধিমতে পাহাড়ে জুম চাষের জন্য জমির মালিকানা স্বত্বের প্রয়োজন হয় না, যার কারণে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে স্থাবর সম্পত্তি তথা ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী বা স্থায়ী মালিকানা স্বত্ব অর্জনের প্রচেষ্টা অতীতে তেমন একটা ছিল না বললেই চলে। এ অবস্থায় সম্পত্তির উত্তরাধিকার অর্জনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পার্বত্য জেলাসমূহে বসবাসকারী তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে অতীতে তেমন সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেনি। ইদানিংকালে জুম চাষের জন্য নুতন নুতন জমির অপ্রতুলতা এবং পর্যায়ক্রমে একই জমিতে বংশানুক্রমিকভাবে অবস্থানের কারণে তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর মধ্যে উদ্যান কৃষির প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি বর্তমান শিক্ষিত সমাজে ভূসম্পত্তির উপর স্থায়ী মালিকানা স্বত্ব অর্জনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণার উদ্ভব হচ্ছে।

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজভূক্ত একটি পরিবারে কেউ মারা গেলে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের দায়-দায়িত্ব পালন, মৃতের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং পারিবারিক কর্তব্য হিসেবে সমাজে স্বীকৃত।

৫.২ **তঞ্চঙ্গ্যা উত্তরাধিকারের সাধারণ নীতিঃ-**

উত্তরাধিকারঃ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তঞ্চঙ্গ্যা সমাজভূক্ত পরিবারে কেউ মারা গেলে তার সৎকার, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের বেলায় সামাজিক রীতিনীতি অনুসরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সমাজের অনুশাসন ও রীতি অনুসারে মৃতের আত্মার সদ্‌গতির জন্য বিশেষ কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হতে হয়।

৫.৩ **উত্তরাধিকারযোগ্য সম্পত্তি কি কিঃ** সম্পত্তির মালিক মৃত্যুকালে যেসব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রেখে মারা যান সেসবই উত্তরাধিকারযোগ্য সম্পত্তি হিসেবে গণ্য। অস্থাবর সম্পত্তি যেমনঃ- আসবাবপত্র, থালা-বাটি, কাপড়-চোপড়, অলংকার, গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদিও উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে আপোষ রফায় ভাগবন্টন ও হস্তান্তর হয়। কিন্তু লিখিত কোনো আইন বা বিধি-বিধানমতে সেগুলো ভাগবন্টন করা হয় না। কেবলমাত্র ভূমি তথা জায়গা-জমিকে স্থাবর সম্পত্তি হিসেবে সামাজিক বিধি-বিধানমতে ভাগবন্টন করা হয়। তাই উত্তরাধিকারযোগ্য সম্পত্তি বলতে সাধারণভাবে স্থাবর সম্পত্তিকেই বুঝানো হয়।

Scanned with OKEN Scanner

কিন্তু একজন সম্পত্তির মালিকের সম্পূর্ণ স্থাবর সম্পত্তি উত্তরাধিকারযোগ্য সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে না। সম্পত্তির মালিকের মৃত্যুর পর তার সৎকার/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয়, তার অনাদায়ী ঋণ (যদি থাকে) এবং জীবদ্দশায় দখল হস্তান্তরিত হয়েছে কিন্তু মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়নি এমন ভূ-সম্পত্তির দায়/দেনা মেটানোর পর যা অবশিষ্ট থাকবে তার উপরই উত্তরাধিকারীগণের অধিকার বর্তাবে।

৫.৪ **সম্পত্তির উত্তরাধিকার রীতিঃ** তিন পার্বত্য জেলার সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ইউ.পি চেয়ারম্যান/কার্বারী/পৌর চেয়ারম্যান/সার্কেল চীফ এর নিকট হতে মতামত ও সুপারিশ গ্রহণ পূর্বক ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনের ৭ ধারামতে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট জেলার দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে বিবিধ মামলা মুলে তিনি মৃত ব্যক্তির আইনগত উত্তরাধিকারীগণকে উত্তরাধিকার সনদপত্র প্রদান করেন।

পার্বত্য জেলাসমূহে বসবাসকারী তঞ্চঙ্গ্যা পরিবারে কারো মৃত্যুর পর তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ব্যয়িত খরচ, তার জীবদ্দশায় অনাদায়ী ঋণ এবং জীবদ্দশায় কোনো সম্পত্তির দান বা বিক্রি কিংবা মৃত্যুর পূর্বে সম্পাদিত উইল ইত্যাদির দাবী পরিশোধ বা নিষ্পন্ন করার পর তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে উত্তরাধিকারযোগ্য সম্পত্তি নির্ধারণ করার রীতির প্রচলন রয়েছে।

৫.৫ **উত্তরাধিকারযোগ্য পদ ও পদবীঃ** পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি ১৯০০ এর ৪৮ বিধিতে সার্কেল চীফ নিয়োগ এবং হেডম্যান নিয়োগ ও বরখাস্তের বিষয়ে লিপিবদ্ধ আছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি ১৯০০ এর ৪৮ বিধিতে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের হেডম্যান/কার্বারী এসব পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সার্কেল চীফের সুপারিশ বা মতামতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। হেডম্যান/কার্বারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র যদি যোগ্য হন তাকে সেই পদে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

৫.৬ **তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের উত্তরাধিকার প্রশ্নে অগ্রাধিকার ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাসঃ-**

ক) চাকমা, বোমাং ও মং সার্কেলে মৃত ব্যক্তির পুত্র তার অপ্রতিরোধ্য আইনগত উত্তরাধিকারী। তার উপস্থিতি অন্য সকল নিকটাত্মীয়ের অধিকারকে খর্ব করবে। সন্তান বলতে- ঔরসজাত ও দত্তক সন্তানকে বুঝাবে। পুত্রের মৃত্যুজনিত কারণে মৃত পুত্রের সন্তানগণ আইনগত উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য হবে। চাকমা, বোমাং ও মং সার্কেলে বসবাসকারী তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে পিতা/স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্র সন্তান ও স্ত্রী উত্তরাধিকারী হবে।

খ) পিতার মৃত্যুর পর পুত্র সন্তানই পিতার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। পুত্র সন্তান বর্তমান থাকলে, কন্যা সন্তান পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না।

Scanned with OKEN Scanner

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দত্তক (পাল্যা/পালক্যা)

৬.১ **দত্তকঃ** তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে সন্তান দত্তক গ্রহণ করা সমাজসিদ্ধ। তঞ্চঙ্গ্যা যে পরিবারে দত্তক পুত্র বা কন্যা সস্নেহে লালিত-পালিত হবে সেই পরিবারের পদবী তার নামের শেষে ধারণের এবং পালক পিতা-মাতার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিতে অন্য সন্তানগণের ন্যায় অংশলাভের অধিকারী হবে। এক্ষেত্রে দত্তক গ্রহীতার ঔরসজাত সন্তান থাকলে দত্তক সন্তানকে নিজ জীবদ্দশায় দান বা উইলের মাধ্যমে স্থাবর সম্পত্তি প্রদান করতে হয়। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি ১৯০০ এর ৪৮ বিধিমতে নিয়োগযোগ্য হেডম্যান, কার্বারী এ সকল পদে দত্তক পুত্র বা কন্যা মৃত পিতার পদের অধিকারী হবে না। সন্তান দত্তক দেবার (পাল্যা/পালক্যা) ক্ষেত্রে অবশ্যই দাতা কর্তৃক তার (গর্ভজাত/ঔরশজাত) সন্তানকে সমাজ স্বীকৃত রীতি ও ধর্মীয় নিয়মে গ্রহীতার কাছে হস্তান্তর করতে হবে। অবশ্য ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ১২(ই) ও ১৯ বিধিমতে দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিবন্ধন শাখায় জেলা প্রশাসকের অনুমতি পত্র রেজিষ্ট্রি করা বাধ্যতামূলক। উপরোক্ত বিধিমতে রেজিষ্ট্রেশন ব্যতিরেকে কোনো তঞ্চঙ্গ্যা পরিবারের পিতা-মাতা, বিধবা বা অবিবাহিত, বিপত্নীক বা অপুত্রক কর্তৃক দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে দত্তক সন্তানের জন্মদাতা পিতা-মাতার সম্মতি থাকলেই তা প্রথাসিদ্ধ হবে। সমাজের প্রথাসিদ্ধ নিয়মে দত্তক গ্রহণ করা হলে সেই দত্তক সন্তান তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের স্বীকৃতি লাভ করবে। এক্ষেত্রে একমাত্র বৌদ্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসকে সন্তান দত্তক গ্রহণের অন্যতম ভিত্তি হিসাবে গুরুত্ব দেয়া হয়। দত্তক দাতা পিতা-মাতা শ্রদ্ধেয় বৌদ্ধ ভিক্ষুর সামনে এ মর্মে প্রতিজ্ঞা করে যে, দত্তক সন্তানকে আর কোনোদিন ফেরৎ পাবার দাবী করবে না এবং দত্তক গ্রহীতা পিতা-মাতাকে প্রতিজ্ঞা করতে হয় যে, দত্তক সন্তানের সাথে তারা নিজ সন্তানের ন্যায় আচরণ করবেন। তাই দত্তক সন্তানকে ধর্মতঃ সন্তানরূপেও গণ্য করা হয়। দত্তক গ্রহীতা পিতা-মাতাকে নিজ ঔরসজাত বা গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় পরম স্নেহে লালন পালনের স্বতঃ মনোবৃত্তি নিয়ে দত্তক গ্রহণ করতে হবে।

৬.২ **সন্তান দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে প্রচলিত সংস্কার ও রীতিনীতির বাধ্যবাধকতাঃ** সন্তান দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে কতিপয় সংস্কার ও রীতিনীতি অনুসরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যা নিম্নরূপঃ-

(ক) সন্তানটি দত্তক গ্রহীতা পিতা-মাতার অনাত্মীয় হওয়া বাঞ্চনীয়।

(খ) ভিন্ন গোত্র, সম্প্রদায় ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বা ভিন্ন সংস্কারে বিশ্বাসী এমন পরিবারের সন্তানকে দত্তক গ্রহণ করা যায়। তবে এরূপ দত্তক গ্রহণ করা অনুচিত। এটাই তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের সংস্কার।

Scanned with OKEN Scanner

(গ) দত্তক গ্রহণের বেলায় সন্তান ভূমিষ্ট হবার পর তার নাভিরজ্জু ছিন্ন হলে অথবা প্রকৃত পিতা-মাতা সম্পর্কে শিশুটির চেনা-জানা বা বোধোদয় সৃষ্টির পূর্বে হস্তান্তর হওয়া আবশ্যক।

(ঘ) সন্তানকে দত্তক প্রদানের বিপরীতে দত্তক গ্রহীতা পিতা-মাতার নিকট হতে কোনো কিছুর বিনিময় বা প্রতিদান গ্রহণ করাটা জন্মদাতা পিতা-মাতার বেলায় অনুচিত।

৬.৩ **তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে সন্তান দত্তক প্রদানে সক্ষম কারাঃ-**

(ক) **বিধবা নারীঃ** তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে। মৃত ব্যক্তির শিশু সন্তানকে পিতৃ পরিবারের নিকটাত্মীয়গণ যদি লালন-পালন ও ভরন-পোষণ প্রদানে অসমর্থ বা অনাগ্রহী হয়, সেক্ষেত্রে বিধবা তার দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের পর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত সন্তান বা স্বামীর মৃত্যুর পর ভূমিষ্ট হওয়া সন্তানের মঙ্গলার্থে, দত্তক গ্রহণে আগ্রহী এবং সক্ষম কোনো ব্যক্তির নিকট সন্তানকে হস্তান্তর করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে মৃত স্বামীর নিকটাত্মীয় যেমনঃ- আজু-নানু (ঠাকুরদা-ঠাকুরদি), জেঠা-কাকা এর অনুমতির প্রয়োজন হবে।

(খ) **বিপত্নীকঃ** সন্তান প্রসবকালে বা দুরারোগ্য ব্যাধিজনিত কারণে অথবা সন্তান প্রসবের পর স্ত্রীর মৃত্যু হলে সেক্ষেত্রে বিপত্নীক ব্যক্তি তার সন্তানের কল্যাণার্থে দত্তক গ্রহণে আগ্রহী এবং সক্ষম কোনো ব্যক্তির নিকট সন্তানকে দত্তক প্রদান করতে পারবেন।

(গ) **অবিবাহিত নারীঃ** প্রেম সম্পর্কজনিত যৌন মিলনের কারণে অবৈধ সন্তান ভূমিষ্ট হবার পর জন্মদাতা পুরুষ যদি উক্ত সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার না করে এবং গর্ভধারীণি যদি সন্তানের পিতৃত্ব প্রমাণে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে গর্ভধারীণি তার সন্তানকে দত্তক গ্রহণে আগ্রহী এবং সক্ষম কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করতে পারবেন।

(ঘ) **পিতা-মাতার সম্মতিক্রমেঃ** সন্তানের ভরন-পোষণ দিতে পরিবারের অসামর্থ্য বা অসম্মতি কিংবা পারিবারিক অশান্তি অথবা বিবাহ বিচ্ছেদের উদ্ভব হলে পিতা-মাতা উভয়ের সম্মতিতে দত্তক গ্রহণে আগ্রহী এবং সক্ষম কারো কাছে সন্তানকে হস্তান্তর করা যাবে।

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে দত্তক গ্রহণের বেলায় উপরোক্ত নিয়ম থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি ১৯০০ এর ১২(ই) ও ১৯ বিধিমতে দত্তক গ্রহণের দলিল রেজিষ্ট্রি করার জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নিবন্ধন শাখায় জেলা প্রশাসকের অনুমতি পত্র নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক। উক্ত বিধিমতে দত্তক গ্রহণের দলিল রেজিষ্ট্রি না হবার কারণে তা আইনসম্মত না হলেও তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি অনুসারে দত্তক নেওয়া হলে তা প্রথাসিদ্ধ হিসেবে সমাজের স্বীকৃতি পাবে।

৬.৪ **তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে দত্তক গ্রহণে সক্ষম কারাঃ** তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে প্রচলিত প্রথা অনুসারে দত্তক সন্তান গ্রহণের জন্য সক্ষমতা নিম্নরূপঃ-

Scanned with OKEN Scanner

স্ত্রী তার দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের জন্য সামাজিক আদালতে কিংবা দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের করার অধিকার রাখেন।

চ) **স্বামীর দ্বিতীয় বা একাধিক বিবাহে আপত্তি করার অধিকারঃ** স্বামীর দ্বিতীয় বা একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে স্ত্রী আপত্তি করার অধিকার রাখেনঃ প্রয়োজনে বাংলাদেশ দন্ডবিধি ৪৯৪ ধারামতে আইনের প্রতিকার পাবার অধিকারী হবেন।

ছ) **বিবাহ বিচ্ছেদঃ** স্বামী পুরুষত্বহীন বা নপুংশক হলে অথবা দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হলে কিংবা মানসিক ভারসাম্যহীন হলে, স্বামী বহু বছর বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড ভোগে থাকলে অথবা স্ত্রীর অসম্মতিতে দ্বিতীয় বা একাধিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে স্ত্রী সামাজিক আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পাদনের অধিকারী হবেন।

জ) **স্বামীর মৃত্যুজনিত/বিচ্ছেদ প্রাপ্ত স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহ করার অধিকারঃ** স্বামীর মৃত্যু হলে অথবা স্বামী কর্তৃক স্ত্রী বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হলে অথবা স্ত্রী সামাজিক আদালতের মাধ্যমে স্বামীকে বিচ্ছেদ প্রদান করলে সেই স্ত্রী দ্বিতীয় বিবাহ করার অধিকারী হবেন। সেক্ষেত্রে স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামীর সম্মতিতে পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত নাবালক সন্তানের হেফাজত বা নিজের কাছে রাখার (Custodian) অধিকারী হবেন।

ঝ) **বিবাহ বিচ্ছেদকালে নাবালক সন্তানের হেফাজতঃ** স্বামী বা স্ত্রী যার দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ হোক না কেন, বিচ্ছেদকালে যদি নাবালক সন্তান থাকে তবে সেই সন্তান সাবালকত্ব অর্জন না করা পর্যন্ত তাকে হেফাজতে (Custodian) রাখার অধিকার স্ত্রীর থাকবে। সেক্ষেত্রে সন্তানের জন্মদাতা পিতা নাবালকের ভরন-পোষণ প্রদানে আইনতঃ বাধ্য থাকবে।

৭.৩ **বিধবার অধিকারঃ** তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহ না হলে উক্ত বিধবা নারী সমাজের রীতি অনুসারে নিম্নোক্ত অধিকার ভোগ করবেঃ-

ক) স্বামীর মৃত্যুর পর জেলা প্রশাসকের প্রদত্ত উত্তরাধিকার সনদপত্রে মৃত স্বামীর উত্তরাধিকারীগণের ক্রমতালিকায় বিধবার স্থান সর্বাগ্রে থাকবে।

খ) স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রী তার স্বামীর আইনগত উত্তরাধিকারী হবে ও সহ-অংশীদারগণের নিকট হতে ভরন-পোষণ পাবেন। স্বামী সরকারী চাকুরীজীবি হলে পেনশন পাবার অধিকারী হবেন।

গ) **নাবালক সন্তানের অভিভাবকত্বঃ** স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রীর যদি নাবালক সন্তান থাকে সেক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সনদপত্র জারী করার সময় জেলা প্রশাসকের আদেশ দ্বারা তিনি নাবালক সন্তানের বৈধ ও আইনগত অভিভাবক নিযুক্ত হবার অধিকারী হবেন।

ঘ) **নাবালকের সম্পত্তি তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকারঃ** স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রী তার নাবালক সন্তানের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আইনতঃ তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এবং সম্পত্তির উন্নয়ন সাধন ও ভাড়া প্রদান কিংবা বর্গা

Scanned with OKEN Scanner

দিতে পারবেন। সম্পত্তি রক্ষার প্রয়োজনে তিনি দেওয়ানী আদালতে আইনতঃ মামলা মোকদ্দমা দায়ের ও জবাব দাখিল করতে পারবেন।

ঙ) **নিজ সম্পত্তি ও মৃত স্বামীর সম্পত্তি হস্তান্তরের অধিকারঃ** স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রী নিজ নামীয় সম্পত্তিকে আইনের বিধান সাপেক্ষে নিজ ইচ্ছানুসারে বিক্রয়, দান, ইজারা, বন্ধক ও বর্গা দিতে পারবেন। প্রয়োজনে আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে বিধবা নিম্নোক্ত কারণে মৃত স্বামীর সম্পত্তি বিক্রয় করার অধিকারী হবেন। যেমনঃ-

(ক) মৃত স্বামীর অনাদায়ী ঋণ বা দেনা থাকলে;

(খ) কন্যা সন্তানের বিবাহের ব্যয় কিংবা নাবালক সন্তানের পড়ালেখার ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(গ) ভরন-পোষণ এবং চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের প্রয়োজনে;

(ঘ) সম্পত্তির দ্বিগুণ মূল্য লাভ করা গেলে;

(ঙ) যেক্ষেত্রে সম্পত্তির আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী;

(চ) যেক্ষেত্রে সম্পত্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে;

(ছ) যেক্ষেত্রে সম্পত্তি অন্যায়ভাবে বেদখল হয়েছে এবং যা ন্যায়সঙ্গতভাবে উদ্ধারের কোনো সম্ভাবনা নেই।

(**ব্যাখ্যাঃ** পার্বত্য চট্টগ্রামের যে কোনো স্থাবর সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো প্রকার হস্তান্তর করা যায় না। পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০ এর ১৮ ধারামতে প্রণীত রুলস সমূহের ৩৪(৪)- এর বিধান হলোঃ- নিম্নরূপঃ- No lesee or sub-lesee shall be allowed to transfer by sale, gift or mortgage the whole or any part of his holding without the previous sanction of the Deputy Commissioner).

৭.৪ **বিধবার অধিকার লোপঃ** তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে একজন বিধবা মহিলার প্রাপ্য অধিকার নিম্নোক্ত কারণে সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে লোপ পাবেঃ-

ক) যদি উক্ত বিধবা মহিলা দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন সেক্ষেত্রে মৃত স্বামীর সংসারে প্রাপ্য সকল অধিকার তার জন্য বিলুপ্ত হবে।

খ) স্বামীর মৃত্যুবরণের দিন হতে ২৮০ দিন পর বা ধাত্রী বিদ্যামতে যদি বিধবা অবৈধভাবে গর্ভবতী হয় এবং সামাজিক আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহলে মৃত স্বামীর সংসারে প্রাপ্য সকল অধিকার হতে তিনি বঞ্চিত হবেন।

গ) **অসামাজিক, অনৈতিক ও বেপরোয়া জীবনযাপনঃ** স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রী যদি অসামাজিক, অনৈতিক ও বেপরোয়া জীবনযাপনে লিপ্ত হয় এবং সামাজিক আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত বিধবা তার স্বামীর সংসারে প্রাপ্য সমস্ত অধিকার হতে বঞ্চিত হবে।

Scanned with OKEN Scanner

নবম পরিচ্ছেদ

নাবালকের অভিভাবকত্ব

৯.১ **নাবালকের সংজ্ঞাঃ** তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে নাবালক নির্ধারণের জন্য সুনির্দিষ্ট বয়সসীমার কোনো মাপকাঠি নেই। সাধারণতঃ শিশু হতে কিশোর বয়স অতিক্রমের পর পূর্ণাঙ্গ যুবক না হওয়া পর্যন্ত নাবালক হিসাবে গণ্য করা হয়। তবে নাবালকের বয়সের প্রশ্নে যদি তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে কোনো প্রকার আইনগত সমস্যার উদ্ভব ঘটে সেক্ষেত্রে অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন ১৮৯০[২৬] (১৮৯০ সালের ৮নং আইন), ১৮৭৫ সালের সাবালকত্ব আইন[২৭] (১৮৭৫ সালের ৯নং আইন), বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯[২৮] (১৯২৯ সালের ১৯নং আইন) এবং নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ২০০০[২৯] (২০০০ সালের ৮নং আইন) এর অধীনে নাবালক ও সাবালকত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৯.২ **নাবালকের অভিভাবকঃ** তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে ভিন্ন কোনো কিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত পিতাই হবেন নাবালক সন্তানের আইনগত অভিভাবক। পিতার অবর্তমানে কার্বারী/হেডম্যান/সার্কেল চীফের মতামত সাপেক্ষে ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনের ৭ ধারায় বর্ণিত ক্ষমতাবলে জেলা প্রশাসকের আদালত কর্তৃক উত্তরাধিকার সনদপত্র প্রদানের সময় মাতাকেই সচরাচর নাবালকের অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়। নাবালকের শরীর এবং সম্পত্তি অথবা উভয়ের হেফাজতকারীকে অভিভাবক বলা হয়। অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন ১৮৯০[৩০] এর ৪(২) ধারা অনুসারে অভিভাবক সেই ব্যক্তি, যিনি নাবালকের শরীর ও সম্পত্তি উভয়ের হেফাজত বা দেখাশুনা করেন। সাবালকত্ব আইনের ৩ ধারা অনুসারে ১৮ বছর পূর্ণ হলে নাবালকত্বের অবসান ঘটে। তবে সম্পত্তির ক্ষেত্রে এবং আদালত কর্তৃক কোনো অভিভাবক নিযুক্ত হয়ে থাকলে সেক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী ২১ বছরে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়। অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন ১৮৯০ (১৮৯০ সালের ৮নং আইন) এর ৭(১) ধারায় আরও বলা হয়েছে, যেক্ষেত্রে আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, নাবালকের কল্যাণার্থে তার শরীর অথবা সম্পত্তি উভয়ের স্বার্থে একজন অভিভাবক নিয়োগ করা অথবা কোনো ব্যক্তিকে এরূপ অভিভাবক ঘোষণা করা প্রয়োজন রয়েছে সেক্ষেত্রে আদালত তদানুসারে অভিভাবক নিয়োগ করতে পারেন। তবে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে পিতা-মাতার মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে, সেক্ষেত্রে নাবালক সন্তানের অভিভাবকত্বের প্রশ্নে মাতার দাবী অগ্রগণ্য হবে। মাতার অবর্তমানে সহোদর বড় ভাই, তার অবর্তমানে সহোদরা বড় বোন অথবা উভয়ের অবর্তমানে রক্ত সম্পর্কীয় জেঠা বা কাকার দাবী অগ্রগণ্য হবে।

৯.৩ **নাবালকের অভিভাবকের শ্রেণী বিভাগঃ** তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে নাবালকের অভিভাবকত্বকে নিম্নমতে শ্রেণী বিভাগ করা যায়ঃ-

Scanned with OKEN Scanner

ক) **স্বাভাবিক অভিভাবক বা আইনসঙ্গত অভিভাবকঃ** সন্তান ভূমিষ্ট হবার সাথে সাথে পিতাই হবেন ভূমিষ্ট সন্তানের স্বাভাবিক অভিভাবক বা আইনসঙ্গত অভিভাবক। পিতার অবর্তমানে মাতা হবেন নাবালকের অভিভাবক। তাদের অবর্তমানে সহোদর বড় ভাই, তার অবর্তমানে সহোদরা বড় বোন অথবা উভয়ের অবর্তমানে রক্ত সম্পর্কীয় জেঠা বা কাকার দাবী অগ্রগণ্য হবে।

খ) **কার্যতঃ/বাস্তব অভিভাবকঃ** পিতা-মাতার অবর্তমানে নাবালক/নাবালিকা যার তত্ত্বাবধানে, তদারকিতে এবং ভরন-পোষণে লালিত-পালিত হবে এবং একই সাথে নাবালক/নাবালিকার ভাল-মন্দের প্রতিবিধান যিনি করবেন তিনিই হবেন নাবালকের কার্যতঃ/বাস্তব অভিভাবক।

গ) **আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অভিভাবকঃ** উপরোক্ত বর্ণনামতে কোনো প্রকার অভিভাবকের অস্তিত্ব যদি না থাকে সেক্ষেত্রে নাবালকের সম্পত্তি রক্ষার জন্য আদালত কর্তৃক যিনি অভিভাবক ঘোষিত হবেন তিনি আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অভিভাবক রূপে গণ্য হবেন।

৯.৪ **অভিভাবক দাবীদারগণের অগ্রাধিকার ভিত্তিক ক্রমবিন্যাসঃ** তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে আসল অভিভাবক বর্তমান থাকলে অন্য কারো দাবী অগ্রহণযোগ্য হবে। আসল অভিভাবকের অবর্তমানে বা আসল অভিভাবক শারীরিকভাবে অক্ষম ও উন্মাদ বা মানসিক বিকারগ্রস্থ হলে তবে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের পারিবারিক গঠন অনুসারে নাবালকের অভিভাবক দাবীদারগণের অগ্রাধিকার ভিত্তিক ক্রমবিন্যাস নিম্নরূপঃ-

ক) **পৃথকান্নবর্তী পরিবারঃ** প্রথমে নাবালকের মাতা, মাতার অবর্তমানে বা অক্ষমতায় কিংবা না দাবীতে কার্যতঃ অভিভাবক ও ভরন-পোষণ দাতা যথাঃ- পিতামহ, অতঃপর নাবালকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অগ্রাধিকার পাবে।

খ) **একান্নবর্তী পরিবারঃ** উপরোক্ত 'ক' অংশের বর্ণনামতে অগ্রাধিকার দাবীদারগণের অবর্তমানে কার্যতঃ/বাস্তব অভিভাবক ও যৌথ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালনকারী এবং ভরন-পোষণ দাতা নাবালকের জেঠা কিংবা কাকা অগ্রাধিকার পাবেন।

৯.৫ **নাবালকের দেহের অভিভাবকত্বের দাবীর অগ্রাধিকারের ক্রমঃ** কোনো নাবালক/নাবালিকা সন্তানের পিতা এবং মাতা উভয়ে দেহের অভিভাবকত্ব দাবী করলে সেক্ষেত্রে মাতার দাবী অগ্রগণ্য হবে। আবার যদি কোনো নাবালক/নাবালিকা সন্তানের পিতা-মাতার কেউই সন্তানের দেহের অভিভাবক হতে না চায়, সেক্ষেত্রে দুগ্ধপোষ্য শিশুর সুবিধা ও জীবন রক্ষার্থে মাতাকেই নাবালক সন্তানের অভিভাবকত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়। তবে উভয় ক্ষেত্রে পিতাকেই নাবালক/নাবালিকা সন্তানের ভরন-পোষণের ব্যয় আইনতঃ বহন করতে হয়।

মন্তব্যঃ সাধারণত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রেই নাবালক/নাবালিকা সন্তানের অভিভাবকত্ব, বিশেষতঃ লালন-পালন ও ভরন-পোষণের প্রশ্নে বিরোধ ও সমস্যা দেখা দেয়।

Scanned with OKEN Scanner

দশম পরিচ্ছেদ

দান

১০.১ **দানের সংজ্ঞাঃ** ১৮৮২ সালের[৩২] সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের বিধানমতে দান হলো দাতা নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক দান গ্রহীতা নামক অপর এক ব্যক্তিকে বিদ্যমান কোনো সুনির্দিষ্ট অস্থাবর অথবা স্থাবর সম্পত্তি স্বেচ্ছায় এবং প্রতিদান বা মূল্য গ্রহণ ব্যতিরেকে হস্তান্তর করা এবং দান গ্রহীতা অথবা তার পক্ষে গ্রহণ করা।

১০.১.১ **দানের অপরিহার্য শর্তাবলী/বৈশিষ্ট্যসমূহঃ** যে দানের মাধ্যমে দাতা একটি নির্দিষ্ট সম্পত্তিতে তার সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করেছে, তাতে পরবর্তীকালে কোনো শর্ত জুড়ে দেয়া যাবে না।

১০.১.২ **হস্তান্তরঃ** দান হলো মালিকানা হস্তান্তর। কোনো একটি স্থাবর সম্পত্তি দান মূলে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কেবল একটি চুক্তি দ্বারা সম্পত্তির উপর প্রস্তাবিত দান গ্রহীতার অনুকূলে কোনো স্বার্থ বা অধিকার সৃষ্টি করে না। পরভূমির উপর অধিকার সৃষ্টি বা আরোপন সম্পত্তি হস্তান্তর নয় এবং তা দানের পর্যায়ে পড়ে না[৩৩]।

১০.১.৩ **বিদ্যমান সম্পত্তিঃ** দানের সময় দানীয় সম্পত্তি অবশ্যই বিদ্যমান থাকতে (বাস্তব অস্তিত্ব) হবে। ভবিষ্যতে সৃষ্টি বা অর্জিত হবে এমন কোনো কিছু দান করা যাবে না।

১০.১.৪ **স্বেচ্ছায় দানঃ** স্বেচ্ছায় শব্দ দ্বারা এর সাধারণ অর্থে বাধাহীন, স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগ/ব্যবহার বুঝানো হয়েছে। প্রতিদান ছাড়া, বিনামূল্যে এ যান্ত্রিক অর্থে বুঝানো হয়নি।

১০.১.৫ **প্রতিদান/মূল্যবিহীনঃ** দান হলো প্রতিদান বা মূল্য গ্রহণ ব্যতিরেকে সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তর। যদি কোনো না কোনো ভাবে বা আকারে মূল্য/প্রতিদান গ্রহণ করা হয়, তাহলে তা দান হিসেবে গণ্য হবে না। কোনো হস্তান্তরকারীর ঋণ পরিশোধ করে দেবার প্রতিশ্রুতি একটা উত্তম এবং যথার্থ প্রতিদান। গ্রহীতা কর্তৃক হস্তান্তরকারীর ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব গ্রহণের বিনিময়ে কোনো সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয়ে থাকলে এরূপ লেনদেন দান হিসেবে গণ্য করা হবে না[৩৪]।

১০.১.৬ **কে কে দান গ্রহণ করতে পারেঃ** সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের উল্লেখিত উপায়ে দান গ্রহীতা বলতে একটি নির্দিষ্ট অথবা নির্দিষ্টকরণযোগ্য সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ যার দ্বারা অথবা যার পক্ষে দানটা গ্রহণ করতে অথবা গ্রহণে সম্মতি জানাতে পারে[৩৫]।

১০.১.৭ **দান কখন গ্রহণ করতে হবেঃ** দান অবশ্যই গ্রহীতা (যার নামে দান করা হচ্ছে) অথবা তার পক্ষে কোনো একজনকে গ্রহণ করতে হবে। দানের কোনো প্রস্তাব বাস্তবে গ্রহীতার গ্রহণ ছাড়া কোনো দান সম্পূর্ণ হতে পারে না। দাতার জীবদ্দশায় এবং সে যখন দান করতে সক্ষম তখনই দান গ্রহণ করতে হবে[৩৬]।

Scanned with OKEN Scanner

১০.১.৮ <u>দান গ্রহীতা হিসেবে স্ত্রী ও কন্যা সন্তানঃ</u> চাকমা, বোমাং ও মং সার্কেলে বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যা পরিবারের স্ত্রী এবং কন্যা সন্তান স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী না হলেও স্বামী/পিতার সম্পত্তি দানমূলে গ্রহণ করতে পারে। স্বাভাবিক উত্তরাধিকারীগণের আপত্তি করার কোনো সুযোগ তঞ্চঙ্গ্যা প্রথামতে নেই।

১০.১.৯ <u>দান কখন স্থগিত বা প্রত্যাহার করা যায়ঃ</u> দাতা এবং গ্রহীতা যদি এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, দাতার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয় এ ধরণের কোনো একটা সুনির্দিষ্ট ঘটনা ঘটলে দান স্থগিত বা প্রত্যাহার হবে, তাহলে সে নির্দিষ্ট ঘটনা সত্যি সত্যি ঘটলে দান স্থগিত বা প্রত্যাহার হয়ে যাবে। আর অন্য কোনোভাবে দান স্থগিত বা প্রত্যাহার হবে না[৩৭]।

১০.১.১০ <u>দাতার যোগ্যতাঃ</u> দাতাকে সুস্থ মস্তিস্কসম্পন্ন, শারীরিকভাবে সক্ষম ও দানীয় সম্পত্তির বৈধ মালিক হতে হবে।

১০.১.১১ <u>সমুদয় সম্পত্তি দান করা যায় নাঃ</u> দাতা তার বৈধ উত্তরাধিকারীগণকে বঞ্চিত করে তার সমুদয় সম্পত্তি দান করতে পারেন না। সে তার সম্পত্তির একটা অংশ মাত্র দান করতে পারেন, যদিও অংশটি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই। যদি দাতা তার কয়েকজন উত্তরাধিকারীর মধ্যে মাত্র একজন উত্তরাধিকারীকে তার সম্পত্তির একটি বিশেষ অংশ দান করে দেয়, তাহলে দাতার মৃত্যুর পর তার অবশিষ্ট সম্পত্তির সাথে দানমূলে হস্তান্তরিত সম্পত্তিও যোগ করে সম্পূর্ণ সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সামাজিক প্রথা অনুসারে ভাগ-বন্টন হবে।

যে পুত্র পিতার জীবদ্দশায় উত্তরাধিকারের নিজ অংশ দানমূলে পেয়ে থাকে, সে পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে অংশ দাবী করতে পারবে না।

১০.১.১২ <u>দানের প্রমাণঃ</u> দান গ্রহীতাকে দাতা কর্তৃক দান সম্পাদনের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ ও সম্পাদিত দলিল দাখিল করে প্রমাণ করতে হবে। অন্যথায় দান বাতিল বলে গণ্য হবে।

১০.১.১৩ <u>ব্যাখ্যাঃ</u> উল্লেখিত সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের সংজ্ঞা অনুসারে দান একটি দলিল কিনা সে প্রশ্ন শুধু এর আকারের উপর নির্ভর করে না, ব্যবহৃত শব্দাবলীতে এর যে উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয় তার উপরই নির্ভর করে। সাধারণ প্রমাণ হলো, দলিলের নাম, এর নিবন্ধন, বাতিল/প্রত্যাহার করার ক্ষমতা সংরক্ষণ এবং বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহার।

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে দু'ধরণের দান কার্যক্রম সম্পাদন করা যায়।

ক) অস্থাবর সম্পত্তি

খ) স্থাবর সম্পত্তি।

অস্থাবর সম্পত্তি অস্থায়ী বিধায় এ প্রকারের দানের ক্ষেত্রে দাতা কর্তৃক গ্রহীতার বরাবরে হস্তান্তরের সাথে সাথে দানকার্যটি সম্পাদিত হয়ে যায়। কিন্তু স্থাবর সম্পত্তির বেলায়

Scanned with OKEN Scanner

দান কার্যটি আইনগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ স্থাবর সম্পত্তির বেলায় দান কার্যটি সম্পাদনের সাথে সাথে দাতা কর্তৃক গ্রহীতার বরাবরে সম্পত্তির বৈধ দখল হস্তান্তর করতে হয়। সম্পত্তি হস্তান্তরের পর দাতা বা তার আইনগত উত্তরাধিকারগণের কোনো প্রকার কর্তৃত্ব এতে থাকে না। স্থাবর সম্পত্তি দান কার্য সম্পাদনের পর তা আর প্রত্যাহারযোগ্য নয়।

১০.২ **দান পদ্ধতিঃ** পার্বত্য জেলাসমূহে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজসহ সকল জনগোষ্ঠী সচরাচর দু'ভাবে দান কার্য সম্পাদন করেঃ-

ক) মৌখিক

খ) দান কবলা সম্পাদনের মাধ্যমে।

১০.২.১ **মৌখিক দানঃ** মৌখিক দান দু'ভাবে করা যায়ঃ-

(ক) দানীয় সম্পত্তি স্থাবর হলে দাতা কর্তৃক সম্পত্তি গ্রহীতার বরাবরে মৌখিক দানের মাধ্যমে সরেজমিনে দখল হস্তান্তরের পর সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত নিয়ম অনুসারে ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৩৪(৪) বিধিমতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন করতে হবে এবং ৩৪(৬) বিধিমতে জেলা প্রশাসকের অনুমতি ও পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ৬৪ ধারামতে[৩৮] পূর্ব অনুমোদনের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ১২ বিধিমতে স্থাবর সম্পত্তি দানের দলিল রেজিষ্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। অতঃপর দানীয় স্থাবর সম্পত্তি দান গ্রহীতার নামে মৌজা জমাবন্দীভূক্ত করতে হবে।

(খ) দাতা যদি মৌখিকভাবে স্থাবর সম্পত্তি দানমূলে গ্রহীতার বরাবরে দখল হস্তান্তর করেন কিন্তু উপরোক্ত 'ক' পদ্ধতিতে দানীয় কার্যক্রম আইনগতভাবে সম্পাদনের পূর্বে যদি দাতার মৃত্যু হয়, সেক্ষেত্রে দাতার উত্তরাধিকারীগণের সম্মতিক্রমে মৃত ব্যক্তির মৌখিক দানকৃত স্থাবর সম্পত্তির দানকবলা আইনগতভাবে উপরোক্ত 'ক'তে বর্ণিত পদ্ধতিতে গ্রহীতার বরাবরে সম্পাদন করা যায়। মৌখিক দান যদি মৃতের উত্তরাধিকারীগণ অস্বীকার করেন সেক্ষেত্রে মৌখিক দান গ্রহীতা উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা আদালতের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দান কার্যকর করতে পারেন।

১০.২.২ **দান কবলা সম্পাদনঃ** পার্বত্য জেলাসমূহে দান কবলা দুইভাবে সম্পাদন করা যায়ঃ-

(ক) দাতা যদি কোনো স্থাবর সম্পত্তি ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ১২ বিধিমতে দানপত্র দলিল রেজিষ্ট্রি করে গ্রহীতার বরাবরে দান কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকেন, অথচ নাম পরিবর্তন করে দিতে পারেননি সেক্ষেত্রে মৃত্যুর পূর্বে জেলা প্রশাসক ও পার্বত্য জেলা পরিষদের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে যদি গ্রহীতার বরাবরে স্থাবর সম্পত্তি দখল হস্তান্তর করে থাকেন, তাহলে গ্রহীতা প্রশাসনিকভাবে বা আদালতের মাধ্যমে দানীয় স্থাবর সম্পত্তি মৃতের নাম হতে নিজের নামে নামজারী মূলে রেকর্ড সংশোধন করে নিতে পারেন।

Scanned with OKEN Scanner

(খ) দাতা যদি কোনো স্থাবর সম্পত্তির দখল মৃত্যুর পূর্বে গ্রহীতার বরাবরে গ্রাম্য দলিলের মাধ্যমে হস্তান্তর করে থাকেন, মৃত ব্যক্তির আইনগত উত্তরাধিকারীগণ উক্ত দান অস্বীকার করলে সেক্ষেত্রে সাক্ষ্য আইনের বিধানমতে সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা গ্রহীতা আদালতে গ্রাম্য দলিলের যথার্থতা প্রমাণ করে আদালতের আদেশবলে রেজিষ্ট্রি ও মৃতের নাম হতে গ্রহীতার নামে রেকর্ড সংশোধন পেতে পারেন।

১০.৩ **দানের পরিণতিঃ** দান কার্যক্রম দ্বারা স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের নিয়ম অনুসারে ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৩৪(৪), ৩৪(৬) ও ১২ বিধি এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ৬৪ ধারামতে পরিষদের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে সম্পাদিত হলে তা আর প্রত্যাহারযোগ্য হবে না। সেক্ষেত্রে আইনগত উত্তরাধিকারীগণের ওপরও বাধ্যবাধকতা আরোপিত হবে।

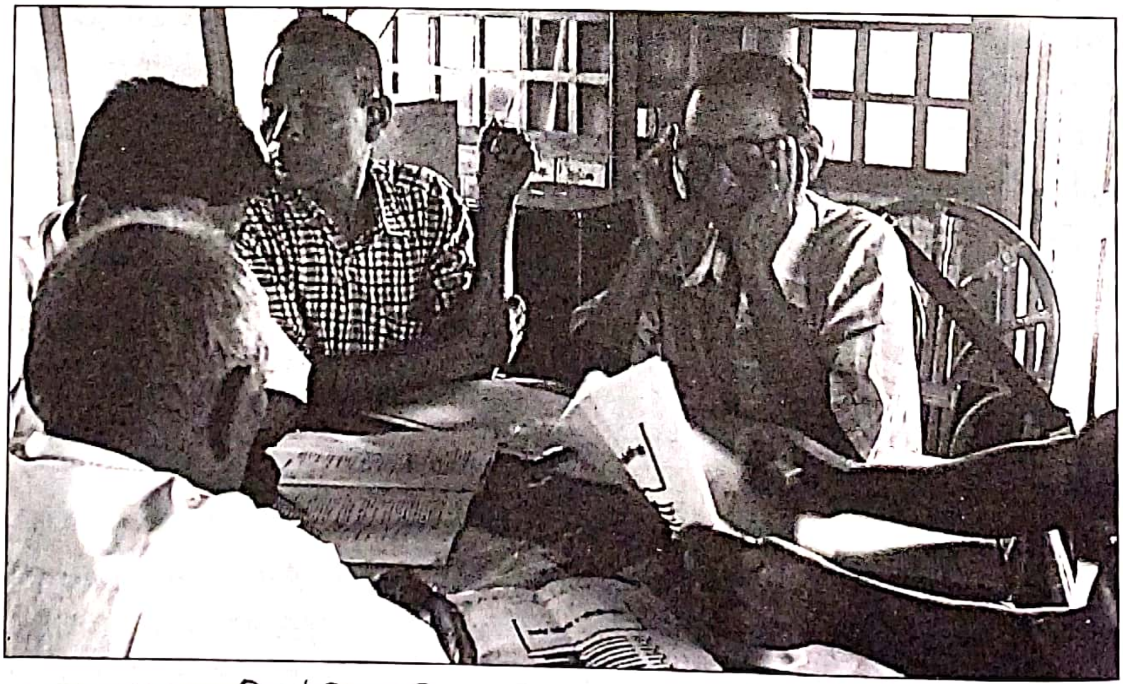

তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী নেতৃত্ব হেডম্যান, কার্বারী ও সামাজিক নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আয়োজিত কর্মশালা

Scanned with OKEN Scanner

একাদশ পরিচ্ছেদ
ভরন-পোষণ (লালন-পালন)

১১.১ **ভরন-পোষণ (লালন-পালন)ঃ** তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের রীতিনীতি অনুসারে ভরন-পোষণ (লালন-পালন) লাভ ব্যক্তির অধিকার ও সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য হিসেবে স্বীকৃত। এর ফলে একপক্ষের প্রতি অন্যপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায় এবং অন্যপক্ষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সক্ষম একজন তঞ্চঙ্গ্যা ব্যক্তিকে তার আর্থিক সঙ্গতি বা সামর্থ অনুসারে নিজ স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও অন্যান্য নিকট আত্মীয়স্বজনের ভরন-পোষণের ব্যয়ভার বহন করতে হয়। অর্থাৎ পরিবারের সদস্যগণ উক্ত ভরন-পোষণকারীর নিকট হতে ভরন-পোষণ পাবার অধিকার রাখে। যিনি সে দায়িত্ব পালন করেন তাকে বলা হয় অভিভাবক আর যারা এই ভরন-পোষণের সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন বা পাবার অধিকারী হন তাদের বলা হয় পোষ্য।

১১.২ **ব্যাখ্যাঃ** অন্যদের ভরন-পোষণ করার জন্য ব্যক্তিগত দায় যাদের, তা নিম্ন প্রকারঃ-

(ক) পিতা তার নাবালক পুত্র ও অবিবাহিতা কন্যার ভরন-পোষণ করতে বাধ্য;

(খ) স্বামী তার স্ত্রীর ভরন-পোষণ করতে বাধ্য; এবং

(গ) পুত্র তার বৃদ্ধ পিতা-মাতার ভরন-পোষণ করতে বাধ্য।

১১.৩ **ভরন-পোষণ বা প্রতিপালন বিধিঃ** পোষ্যদের ভরন-পোষণের বেলায় নিম্নোক্ত নীতিগুলো অনুসরণ করতে হবেঃ-

১১.৩.১ **ভরন-পোষণ দাতার সামর্থ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণঃ** ভরন-পোষণের মান অবশ্যই ভরন-পোষণকারীর আর্থিক সামর্থ্য, সামাজিক অবস্থান এবং মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

১১.৩.২ **ভরন-পোষণের দাবী যুক্তিসম্মত হতে হবেঃ** লালন-পালনকারীর সামর্থ্য অনুযায়ী ভরন-পোষণ লাভের ক্ষেত্রেও পোষ্যদের দাবীর যৌক্তিকতা থাকতে হবে।

ব্যাখ্যাঃ লালন-পালনের মধ্যে শিক্ষা লাভের সুযোগ অন্তর্ভূক্ত। তাই সামর্থ্য অনুযায়ী পোষ্যদের শিক্ষার ব্যয় বহন করাও পিতা বা অভিভাবকের অন্যতম দায়িত্ব।

পোষ্যের সাথে ভরন-পোষণকারী আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতা/দুরত্ব অনুযায়ী ভরন-পোষণকারীর দায়িত্ব দুই প্রকার, যথাঃ-

১১.৪ **অখন্ডনীয় বা নিরঙ্কুশ দায়িত্বঃ** এমন পোষ্য আছে যাদের ভরণ পোষণ করা বাধ্যতামূলক। এই দায়িত্বকে অখন্ডনীয় বা নিরঙ্কুশ দায়িত্ব বলা হয়, যেমনঃ- স্ত্রী, নাবালক কিংবা অক্ষম পুত্র/কন্যা, অবিবাহিতা কিংবা বিধবা কন্যা, বৃদ্ধ পিতা-মাতা ইত্যাদি।

Scanned with OKEN Scanner

১১.৫ **সীমিত বা সম্পত্তি ও শর্ত নির্ভর দায়িত্বঃ** এমন আত্মীয় আছেন বিশেষ অবস্থায় যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব যে কোনো ব্যক্তির উপর বর্তাবে। সেই বাধ্যবাধকতাকে সীমিত বা সম্পত্তি ও শর্ত নির্ভর দায়িত্ব বলা হয়। যেমনঃ- পরিবারে পিতার মৃত্যু হলে বা তিনি অন্য কোনো কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নাবালক কিংবা অক্ষম ভাই-বোন, অবিবাহিত সাবালিকা বোন কিংবা বিধবা বোন কিংবা আজু-নানুর (ঠাকুরদা-ঠাকুরদি) ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে হবে।

১১.৬ **১ ঃ নিরঙ্কুশ দায়িত্ব**

ক. **স্ত্রীর ভরণ-পোষণে স্বামীর দায়িত্বঃ** স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করা স্বামীর নিরঙ্কুশ দায়িত্ব। স্বামীর ভরণ-পোষণ পাওয়া স্ত্রীর অধিকার।

খ. **পুত্র-কন্যার ভরণ-পোষণে পিতার দায়িত্বঃ** নাবালক, শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী পুত্র, কন্যা, নাবালিকা, সাবালিকা, অবিবাহিতা ও বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও বিচ্ছেদ প্রাপ্ত কন্যার ভরণ-পোষণ করা পিতার দায়িত্ব।

গ. **বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পিতা-মাতার ভরন-পোষণে পুত্রের দায়িত্বঃ** বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পিতা-মাতাকে ভরন-পোষণ করা পুত্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য। পিতা-মাতা বলতে সৎ কিংবা পালক পিতা-মাতাও বুঝাবে।

১১.৭ **২ ঃ শর্ত নির্ভর দায়িত্ব**

ক. **স্বামীর ভরন-পোষণে স্ত্রীর দায়িত্বঃ** স্বামী দুরারোগ্য কোনো ব্যাধি বা হঠাৎ দূর্ঘটনার কারণে শারীরিকভাবে পঙ্গু হয়ে গেলে তার স্ত্রীকে সামর্থ্য অনুযায়ী স্বামীর ভরন-পোষণের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

খ. **পুত্র-কন্যার ভরন-পোষণে মাতার দায়িত্বঃ** স্বামী দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বা হঠাৎ দূর্ঘটনার শিকার হয়ে পঙ্গু কিংবা মারা গেলে স্ত্রী তার সন্তান সাবালক না হওয়া পর্যন্ত নাবালক পুত্র, নাবালিকা কন্যা বা অবিবাহিত কন্যার অভিভাবক নিযুক্ত হবেন। অভিভাবক হিসেবে সন্তানদের ভরন-পোষণের দায়িত্বও তার উপর বর্তাবে। তিনি স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে ভরন-পোষণ ব্যয় বহন করতে পারবেন।

গ. **পিতা-মাতার ভরন-পোষণে কন্যার দায়িত্বঃ** কোনো পিতা-মাতার পুত্র সন্তানের অবর্তমানে কন্যা সন্তান (সন্তানগণই) পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। সেক্ষেত্রে কন্যা/কন্যাগণকেই পিতা-মাতার ভরন-পোষণের দায়িত্ব পালন করতে হয়।

ঘ. **জামাতা কর্তৃক শ্বশুর-শ্বাশুড়ির ভরন-পোষণঃ** পুত্র সন্তান না থাকলে কন্যাই পিতার উত্তরাধিকারী হয়। সেক্ষেত্রে কন্যার স্বামী তার স্ত্রীর পক্ষে শ্বশুর-শ্বাশুড়ি ও অবিবাহিতা শালিকার ভরন-পোষণের দায়িত্ব পালন করবে।

Scanned with OKEN Scanner

ঙ. **আজু-নানু (ঠাকুরদা-ঠাকুরদি) কর্তৃক নাতি-নাতনীর ভরন-পোষণের দায়িত্বঃ** নাবালক পুত্র/কন্যা রেখে অল্প বয়সে যদি পুত্র মারা যায় কিংবা রোগ বা দূর্ঘটনাজনিত কারণে পঙ্গু হয়ে যায় তখন আজু-নানুর (ঠাকুরদা-ঠাকুরদি) উপরই তাদের মৃত বা অক্ষম পুত্রের ঔরসজাত সন্তান (নাতি/নাতনী) লালন-পালন ও ভরন-পোষণের দায়িত্ব বর্তায়। একই সাথে পঙ্গু বা মৃত পুত্রের স্ত্রীর (পুত্রবধূ) ভরন-পোষণের দায়িত্বও শ্বশুর হিসেবে তার উপর বর্তায়।

চ. **জেঠা ও কাকা কর্তৃক ভাইপো-ভাইঝির ভরন-পোষণের দায়িত্বঃ** একান্নবর্তী পরিবারের কোনো ভাই যদি স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা সন্তান রেখে হঠাৎ মারা যায় কিংবা দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পঙ্গু হয়ে যায়, তাহলে সেই পরিবারের অভিভাবক বা সংসার পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত অপর ভাইকে মৃত/পঙ্গু ভাই এর স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদের পৃথকান্নে না যাওয়া পর্যন্ত যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি থেকে ভরন-পোষণ করতে হয়।

ছ. **নাতী কর্তৃক আজু-নানুর (ঠাকুরদা-ঠাকুরদি) ভরন-পোষণঃ** বৃদ্ধ পিতা-মাতা, স্ত্রী ও পুত্র কন্যা রেখে পরিবারের অভিভাবক কোনো পুত্র অকালে মারা গেলে কিংবা রোগ ব্যাধি ও দূর্ঘটনার কারণে পঙ্গু হয়ে গেলে মৃত ব্যক্তির সাবালক পুত্রকে পরিবার পরিচালনাসহ নিজের মাতা ও নাবালক/নাবালিকা ভাইবোন ছাড়াও আজু-নানুর (ঠাকুরদা-ঠাকুরদি) ভরন-পোষণ করতে হয়।

জ. **নাবালক এর আইনগত অভিভাবক/আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অভিভাবকের দায়িত্বঃ** একজন আইনগত অভিভাবকের (দেহের অভিভাবক) দায়িত্ব হলো প্রতিপাল্যকে তার হেফাজতে রাখা, তার ভরন-পোষণ করা, স্বাস্থ্য-সেবা ও শিক্ষা লাভ নিশ্চিত করা এবং প্রতিপাল্য যে ব্যক্তিগত আইনের আওতাভূক্ত সে আইনের বিধানমতে অন্যান্য যা কিছু করা দরকার তা করা।

১১.৮ ভরন-পোষণের দায়িত্ব পালন ও দায়িত্ব বরখেলাপের ফলাফল

ক. **উত্তরাধিকারযোগ্য সম্পত্তি বন্টনে উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির সম্ভবনাঃ** তঞ্চঙ্গ্যা উত্তরাধিকার প্রথার সাধারণ নীতি অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির পুত্র সন্তানগণ ত্যাজ্য সম্পত্তি উত্তরাধিকার রীতি অনুসারে ভাগ পায়। সম্পত্তির মালিক এবং তার স্ত্রীকে যে পুত্র আমৃত্যু ভরন-পোষণ করে এবং তাদের মৃত্যুর পর তাদের সৎকার ও শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পাদন করে, সেই পুত্রকে সমান অংশ থেকে বেশী দেবার রীতি প্রচলিত আছে। উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টনের এই সাধারণ নীতির ব্যতিক্রম কোনো কোনো পুত্র মানতে অস্বীকার করলে তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে।

Scanned with OKEN Scanner

খ. ভরন-পোষণের ব্যয় আদালতের মাধ্যমে আদায়যোগ্যঃ ভরন-পোষণ পাওয়া একটা আইনগত অধিকার। কেউ এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে সে আদালতের মাধ্যমে তা আদায় করতে পারে।

ব্যাখ্যাঃ ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৪০ বিধিমতে তঞ্চঙ্গ্যা সামাজিক আদালত যথাঃ- গ্রাম্য কার্বারী আদালত, হেডম্যান আদালত, চাকমা/বোমাং/মং রাজার আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসকের আদালতে রিভিশন অথবা ১৯৮৯ সনের পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ৬৬ ধারামতে চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার আদালতে আপিল দায়ের করে এই অধিকার আদায় করা যায়। এছাড়া স্ত্রীর খোরপোষ ও সন্তান সন্ততির ভরন-পোষণ বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৮৮[৩৯] ধারামতে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করে আদায় করা যায়।

১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন বিষয়ে রাঙ্গামাটিতে আয়োজিত সেমিনার

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
উইল

১২.১ **উইলের সংজ্ঞাঃ** উইল হলো, কোনো এক ব্যক্তি কর্তৃক তার জীবদ্দশায় সম্পত্তির হস্তান্তর পত্র বা ব্যবস্থা যা তার মৃত্যুর পর কার্যকর হবে। ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন[৪০] ১৯২৫এর ৫২(খ)নং ধারা অনুযায়ী উইল হলো নিজ সম্পদ বা সম্পত্তির ব্যাপারে উইলকারীর ইচ্ছার আইনানুগ ঘোষণা যা তিনি তার মৃত্যুর পর কার্যকর করতে ইচ্ছা পোষণ করেন। এটা একটি গোপন এবং একান্তই ব্যক্তিগত দলিল যা প্রদর্শন কিংবা প্রকাশ করার জন্য আদেশ দেয়া যাবে না।

ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী কোনো স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তর পত্র/ব্যবস্থা পত্র বৈধ হতে হলে সম্পত্তি যে দেশে অবস্থিত অবশ্যই সে দেশের আইনের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ হতে হবে। কাজেই, (ক) উইলকারীর যোগ্যতা, (খ) সম্পত্তির উত্তরাধিকারযোগ্যতা, এবং (গ) দলিলের আনুষ্ঠানিকতা ও আকার/আকৃতির প্রশ্নে দলিলের বৈধতা বিবেচনা করতে হলে, তা উপরে উল্লিখিত বিদ্যমান/বলবৎ আইনের আলোকেই বিবেচনা করতে হবে।

১২.২ **বাংলাদেশের উইল কিভাবে তৈরী/প্রস্তুত করা হয়?ঃ** হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ এবং মুসলমান ছাড়া সব লোকের উইল ভারতীয় উত্তরাধীকার আইন ১৯২৫ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে উইলের আকার/আকৃতিসহ সে আইনের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিধি-বিধানগুলো হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ এবং জৈনদের উইলের বেলায়ও প্রযোজ্য হয়। ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন ১৯২৬[৪১] (সংশোধনী)- এর বিধানমতে একজন মুসলমানের উইল ছাড়া বর্তমানে প্রত্যেক উইল লিখিতভাবে উইলকারী বা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তার সামনে ও তার পরামর্শে স্বাক্ষরিত ও কমপক্ষে দুইজন সাক্ষীর স্বাক্ষরযুক্ত হতে হবে।

১২.৩ **তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে উইল ও উইল সংক্রান্ত নীতিমালাঃ** তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে যে কোনো সাবালক পুরুষ/নারী জীবদ্দশায় উইলমূলে আইনগত উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে নিজ স্থাবর সম্পত্তি ভাগ বন্টন বা জীবনের শেষ ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের বরাবরে ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ১২ বিধিমতে একজন সনাক্তকারীর উপস্থিতিতে ও সনাক্তক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিবন্ধন শাখায় উইলনামা নিবন্ধন করতে পারেন, যা উইলদাতার মৃত্যুর পর কার্যকর হবে। কারণ উইলনামা সম্পাদনের সাথে সাথে উইলদাতার ইচ্ছার প্রতিফলন হয়েছে- এটা তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের স্বীকৃত রীতি। সুতরাং মৃত ব্যক্তির ইচ্ছাকে স্বীকৃতি প্রদান ও সামাজিক রীতিনীতি প্রতিপালন করা মৃতের উত্তরাধিকারীগণের নৈতিক দায়িত্ব। অপ্রতিরোধ্য উত্তরাধিকারী থাকলে তাকে বা তাদেরকে বঞ্চিত করে সমুদয় সম্পত্তি উইল করা প্রথাসিদ্ধ নয়। কোনো ব্যক্তির পুত্র, স্ত্রী ও কন্যা সন্তান থাকলে এদের বঞ্চিত

Scanned with OKEN Scanner

করে তার সমস্ত সম্পত্তি উইল করা যায় না। উইলদাতা ইচ্ছা করলে স্থাবর সম্পত্তির কোনো অংশ নিকটাত্মীয় কিংবা অনাত্মীয়কে শ্রদ্ধা বা স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ উইলমূলে দান/হস্তান্তর করতে পারেন, যা তার মৃত্যুর পর কার্যকর হবে।

১২.৪ **মন্তব্যঃ** একাধিক অপ্রতিরোধ্য উত্তরাধিকারী থাকলে কোনো একক উত্তরাধিকারীর নামে সমুদয় সম্পত্তি উইল প্রথাসিদ্ধ নয়। তাই কোনো ব্যক্তির একাধিক অপ্রতিরোধ্য উত্তরাধিকারী থাকলে কোনো এক উত্তরাধিকারীর নামে সমস্ত/সমুদয় সম্পত্তি উইল হবে না। একাধিক স্ত্রী থাকলে সমুদয় সম্পত্তি এক স্ত্রীর নামে উইল হবে না। কোনো একজন উত্তরাধিকারীকে তার প্রাপ্য সম্পূর্ণ অংশ উইল করে দিলে সে উত্তরাধিকারী এই উইলের দ্বারা যে পরিমাণ সম্পত্তি পেলেন তা বাদ দিয়ে বাকী অংশ সহ-অংশীদারদের অংশ বন্টনে হারাহারি নিয়ম প্রয়োগ হবে।

১২.৫ **মন্তব্যঃ** ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী উইল একটি গোপন এবং একান্ত ব্যক্তিগত দলিল। উক্ত আইনের সংশোধনী অনুযায়ী বর্তমানে সমস্ত উইল লিখিত এবং উইলকারী ও কমপক্ষে দু'জন সাক্ষীর স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক। তবে রেজিস্ট্রেশন আইন অনুযায়ী উইল রেজিষ্ট্রি বাধ্যতামূলক নয়। অন্যদিকে ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ১২ বিধিমতে সকল ধরণের দলিল রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক।

১২.৬ **উত্তরাধিকারযোগ্য পদ উইলযোগ্য নয়ঃ** তঞ্চঙ্গ্যাদের হেডম্যান, কার্বারী ইত্যাদি পদ উইলযোগ্য নয়। উইলকারী ব্যতীত উইল বাতিল করা যায় না। উইলকারী উইল ঘোষণা করার পর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রদ করতে পারে। কিন্তু উইলকারী প্রকাশ্যে রদ করে না গেলে উইলকারীর উত্তরাধিকারীগণ তা রদ বা বাতিল করতে পারে না।

১২.৭ **উইল তামাদিঃ** একজন উইলকারী কোনো বিশেষ সম্পত্তির জন্য উইল করার পর তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উইলকৃত সম্পত্তি নিজেই তার জীবদ্দশায় বিক্রয় ইত্যাদির মাধ্যমে অন্যের নিকট হস্তান্তর করে ফেলেছে, কিন্তু উইল প্রত্যাহার বা রদ করে যেতে পারেনি, সেক্ষেত্রে উইল তামাদি গণ্য হবে।

১২.৮ **আদালতের ঘোষণা দ্বারা জাল/মিথ্যা উইল বাতিলযোগ্যঃ** জাল উইলনামা দ্বারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি নামজারী করে নিলে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ যোগ্য আদালতে উইলের বাতিল চাইতে পারে। উইল জাল প্রমাণিত হলে নামজারীর আদেশসহ উইল বাতিল হবে।

১২.৯ **উইলের ফলাফলঃ** একজন তঞ্চঙ্গ্যা তার কোনো সম্পত্তি বা সম্পত্তির অংশ বিশেষ কারও নামে উইল করে দিয়ে গেলে উইলকারীর মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীগণ সেই উইল কার্যকর করতে বাধ্য এবং উইলের উক্ত সম্পত্তি বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পত্তি উত্তরাধিকারযোগ্য সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে। উইল অনুযায়ী সম্পত্তি না পেলে বঞ্চিত ব্যক্তি মামলা দায়ের করে তা আদায় করতে পারবে।

Scanned with OKEN Scanner

তথ্যসূত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন ও বিচার ব্যবস্থা

১। Act XXII of 1860 Printed in selections from Correspondence on the Revenue Administration of Chittagong Hill Tracts- (1862-1927).

২। Rules for Territorial Circles in the Chittagong Hill Tracts- 1884 Ibid. (প্রাগুক্ত)

৩। Rules for the Administration of the Chittagong Hill Tracts- 1892 Ibid. (প্রাগুক্ত)

৪। Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900 (Act I of 1900).

৫। Rules for the Administration of the Chittagong Hill Tracts- 1900 (made under section 18 of CHTs Regulation 1900).

৬। Hill Tracts Manual (Rules of 1900).

৭। Francis Buchanan in South-Eastern Bengal- 1798. Edited by Williem Ven Schendal.

৮। A History of Chittagong, Vol. 1- Dr. Suniti Bhusan Qanungo.

৯। Selections from the Correspondence on the Revenue Administration of the Chittagong Hill Tracts.

১০। Rules for the Administration of Chittagong Hill Tracts.

১১। Ibid. (প্রাগুক্ত)

১২। Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900.

১৩। Rules for Territorial Circles in the Chittagong Hill Tract (Selected Correspondence on the Revenue Administration of Chittagong Hill Tracts).

১৪। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯নং আইন)

১৫। Selections from Correspondence on the Revenue Administration of CHTs- 1862-1927.

১৬। মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০।

১৭। Chittagong Hill Tracts (Amendment) Regulation, 2003 (Act 38 of 2003).

১৮। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯নং আইন)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠী ঃ রীতিনীতি ও প্রথা

১৯। Indian Succession Act, 1925.

Scanned with OKEN Scanner

২০। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৩নং আইন)।

২১। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বিবাহ (সাঙা)

২২। Majority Act, 1875.

২৩। Guardians and Wards Act, 1890.

২৪। Child Marriage Restraint Act, 1929.

২৫। নারী ও শিশু নির্যাতন আইন, ২০০০

নবম পরিচ্ছেদ
নাবালকের অভিভাবকত্ব

২৬। Guardians and Wards Act, 1890.

২৭। Majority Act, 1875.

২৮। Child Marriage Restraint Act, 1929.

২৯। নারী ও শিশু নির্যাতন আইন, ২০০০

৩০। Guardians and Wards Act, 1890.

৩১। Ibid. (প্রাগুক্ত)

দশম পরিচ্ছেদ
দান

৩২। Transfer of Property Act, 1882.

৩৩। Ibid. (প্রাগুক্ত)

৩৪। Ibid. (প্রাগুক্ত)

৩৫। Ibid. (প্রাগুক্ত)

৩৬। Ibid. (প্রাগুক্ত)

৩৭। Ibid. (প্রাগুক্ত)

৩৮। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯।

একাদশ পরিচ্ছেদ
ভরনপোষণ (লালন-পালন)

৩৯। Criminal Procedure Code, 1898.

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
উইল

৪০। Indian Succession Act, 1925.

৪১। Indian Succession (Amendment) Act, 1926.

Scanned with OKEN Scanner

আনুষঙ্গিক তথ্যসূত্র

ক্রম	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
১.	ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম্য আদালত আইন ম্যানুয়েল	এম.এম.আলী
২.	নারী অধিকার ও আইন	সা'দ উল্লাহ্
৩.	উত্তরাধিকার আইন	মোঃ আলতাফ হোসেন
৪.	সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ভাষ্য	গাজী শামছুর রহমান
৫.	বাংলাদেশে আদিবাসী	জাহান আরা রউফ
৬.	বাংলাদেশে আদিবাসী সমাজের ইতিবৃত্ত	এম. এস. দোহা
৭.	অভিন্ন পারিবারিক আইন	নিউজ নেটওয়ার্ক রিপোর্ট
৮.	বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার	সুগত চাকমা
৯.	বাংলাদেশের আইন, বিচার ব্যবস্থা এবং সাংবিধানিক ক্রমবিকাশ	মোঃ শফিকুর রহমান
১০.	আইন কোষ	মোঃ আব্দুল হামিদ
১১.	পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি	প্রফেসর পিয়ের বেসেইনে
১২.	পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম চাষ	প্রশান্ত ত্রিপুরা ও অবন্তী হারুন (সেড)
১৩.	জাতীয় আদিবাসী গোল টেবিল বৈঠক ডিসেম্বর ১৯৯৭ ঢাকা	ফিলিপ গাইন
১৪.	উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা	
১৫.	উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা (৩য় সংখ্যা)	উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাঙ্গামাটি
১৬.	উপজাতিদের ইতিহাস ও জীবন ধারা	মোঃ আয়নাল হক
১৭.	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি	সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা (উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাঙ্গামাটি)
১৮.	হিন্দু আইনের ভাষ্য	গাজী শামছুর রহমান
১৯.	ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা	মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম লস্কর

Scanned with OKEN Scanner

ক্রম	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
২০.	চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল তার অধিবাসীবৃন্দ	ক্যাপ্টেন টি. এইচ. লুইন
২১.	জাক'র ২৫ বর্ষ পূর্তি সংকলন' ২০০৫	জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল (জাক), রাঙ্গামাটি
২২.	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের আদিম জনগোষ্ঠী	ক্যাপ্টেন টি. এইচ. লুইন
২৩.	পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি	সুগত চাকমা
২৪.	রাঙ্গামাটি বৈচিত্রের ঐকতান	জেলা প্রশাসন, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা
২৫.	তঞ্চঙ্গ্যা জাতি	রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা
২৬.	সাংগু (উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা, সাত)	উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, বান্দরবান
২৭.	সাংগু (উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা, ১ম-৩য় খন্ড)	উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, বান্দরবান
২৮.	সাংগু (উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা, ১ম-৫ম খন্ড)	উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, বান্দরবান
২৯.	সাংগু (উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা, ১ম-১০ম খন্ড)	উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, বান্দরবান
৩০.	অঙ্কুর	নন্দলাল শর্মা সম্পাদিত রাঙ্গামাটি সাধারণ পাঠাগারের প্রথম প্রকাশনা

Scanned with OKEN Scanner

Government of East Pakistan
Office of the Deputy Commissioner
Chittagong Hill Tracts.

Order

It has been brought to my notice that of late the Magistrates Courts as well as the police are taking cognizance of tribal cases whereas tribal courts exist for this purpose vide Rule 40 of the Chittagong Hill Tracts Manual.

It is therefore ordered that henceforth Magistrates Court or the police should not take cognizance of any cases of tribal nature, particularly relating to complaints arising out of enticement/elopement etc. of tribal girls by tribesmen or plainsmen. On receiving such complaints, the Magistrates or the Police Officer concerned must refer the case to the tribal court (i.e. Headman) for necessary action under intimation to the Deputy Commissioner.

Sg/- S.Z. Khan, C.S.P.
5.5.64
Deputy Commissioner
Chittagong Hill Tracts.

Memo. No. 1243(400)/C Dated, Rangamati, the 5th May, 1964.

From: S.Z. Khan, Esq. C.S.P.
Deputy Commissioner
Chittagong Hill Tracts.

Copy forwarded to :

1. The Commissioner, Chittagong Division, Chittagong for favour of information.
2. ....
for information and necessary action.
3. One copy for Standing Order Book.

N.D. 5.5.64

Sg/- S.Z. Khan, C.S.P.
5.5.64
Deputy Commissioner
Chittagong Hill Tracts.

Scanned with OKEN Scanner

পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন সংরক্ষণ ও সচেতনতা উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ে পিপিআইআর প্রকল্পের আওতায় রাঙ্গামাটিতে আয়োজিত সেমিনারে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ

◆ স্থান: জেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

◆ তারিখ: ২৩/০২/২০০৬ইং, বৃহস্পতিবার।

- শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা), চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ।
- ড. মানিক লাল দেওয়ান, চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ।
- ব্যারিষ্টার রাজা দেবাশীষ রায়, চাকমা সার্কেল চীফ, রাঙ্গামাটি।
- মোঃ মহিউদ্দিন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি।
- গৌতম দেওয়ান, সাবেক চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ ও রাঙ্গামাটি পৌরসভা।
- চিংকিউ রোয়াজা, সাবেক চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও হেডম্যান, ৯৮নং কচুখালী মৌজা, কাউখালী, রাঙ্গামাটি।
- দেবদত্ত খীসা, প্রকল্প পরিচালক, CHTRDP.
- রক্তোৎপল ত্রিপুরা, সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ।
- ডাঃ নীলু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ।
- মাধবীলতা চাকমা, সদস্যা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ
- অঞ্জুলিকা খীসা, জেলা শিক্ষা অফিসার, রাঙ্গামাটি।
- কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, নির্বাহী কর্মকর্তা (ভাঃ), পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ।
- তন্দ্রা চাকমা, কেয়ার বাংলাদেশ, রাঙ্গামাটি।
- মঞ্জুলিকা চাকমা, সমাজকর্মী।
- নন্দিত রায়, UNDP.
- রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা, অধ্যক্ষ, চারুকলা একাডেমী, রাঙ্গামাটি।
- নির্মলেন্দু ত্রিপুরা, উপ-মহাব্যবস্থাপক (অবঃ) বিসিক, রাঙ্গামাটি।
- আরতি চাকমা, উপ-পরিচালক (অবঃ), সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর।
- সাহানা দেওয়ান, সহকারী পরিচালক, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট, রাঙ্গামাটি।
- নিরূপা দেওয়ান, প্রধান শিক্ষক, রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়।
- ড. আলো রানী আইচ, ভাইস প্রিন্সিপাল, রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজ।
- প্রফেসর মংসানু চৌধুরী, রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজ।
- টুকু তালুকদার, কোর্ডিনেটর, হিমাওয়ান্তি।
- সুদত্ত বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা, General Secretary, M.R.F.L.R.

Scanned with OKEN Scanner

- সাগরিকা রোয়াজা. Advisor, ত্রিপুরা কল্যাণ ফাউন্ডেশন।
- সুকুমার দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক, উপজাতীয় সামাজিক ফোরাম।
- বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, সংস্কৃতিকর্মী।
- ত্রিবেনী রায় খীসা, Chairperson, HTNWRN.
- রকি চাকমা, সেক্রেটারী, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, রাঙ্গামাটি ইউনিট।
- ঝিমিত ঝিমিত চাকমা, সভাপতি, জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল (জাক), রাঙ্গামাটি।
- শিশির চাকমা, সম্পাদক, জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল (জাক), রাঙ্গামাটি।
- ক্রাজাই চৌধুরী, প্রোগ্রাম অফিসার, SEMP, UNDP.
- এ কে এম মকছুদ আহমেদ, সম্পাদক, দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি।
- মায়াধন চাকমা, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ৬নং বালুখালী ইউ.পি।
- মহতি চাকমা, মহিলা কমিশনার, রাঙ্গামাটি।
- লাল এংলিয়ানা, প্রাক্তন চেয়ারম্যান।
- মোঃ জামালউদ্দিন, নিউজ এজেন্সী, আবাস।
- নাইউপ্রু মারমা মেরী, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, এনজিও ফোরাম।
- এডভোকেট ফনিন্দ্র লাল দাস, রাঙ্গামাটি জজ কোর্ট।
- অলি আহমেদ, প্রতিনিধি, ইউএনবি।
- হরি কিশোর চাকমা, প্রতিনিধি, প্রথম আলো।
- ভবতোষ দেওয়ান, এডভোকেট, রাঙ্গামাটি জজ কোর্ট।
- সত্রং চাকমা, প্রতিনিধি, সমকাল।
- এড. উষাময় খীসা, রাঙ্গামাটি জজ কোর্ট।
- শুভ্রা চাকমা, জাতীয় মহিলা সংস্থা।
- থোয়াই অং মারমা, হেডম্যান।
- মালসমা পাংখোয়া, সমাজসেবক।
- এস পি মারমা, সমাজসেবক।
- শান্তিময় চাকমা, প্রতিনিধি, Bangladesh Observer.
- অনিল চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, সমাজসেবক।
- এ কে এম জহুরুল হক, প্রতিনিধি, New Age.
- অশোক চাকমা, C.F (CIPD).
- দিলীপ পাংখোয়া, প্রাক্তন মেম্বার।
- নন্দন দেবনাথ, প্রতিনিধি, দৈনিক গিরিদর্পণ ও বাংলাভিশন।
- মোস্তফা কামাল, প্রতিনিধি, বিটিভি।
- সুভাষ বসু চাকমা, প্রতিনিধি, হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরাম।
- সুনীতি দেওয়ান, হেডম্যান, ১০৪নং ঝগড়াবিল মৌজা, রাঙ্গামাটি।

Scanned with OKEN Scanner

- এড. রাজীব চাকমা, রাঙ্গামাটি জজ কোর্ট।
- রিকো খীসা, প্রোগ্রাম অফিসার, কোডেক।
- সুনীল বরন চাকমা, হেডম্যান, ৩৮০নং শিশক মৌজা, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি।
- এড. তোষন চাকমা, রাঙ্গামাটি জজ কোর্ট।
- এড. শক্তিমান চাকমা, রাঙ্গামাটি জজ কোর্ট।
- অনুপম দেওয়ান, হেডম্যান।
- সবুজ সিদ্দিকী, প্রতিনিধি, বাসস।
- এড. মিহির বরন চাকমা, রাঙ্গামাটি জজ কোর্ট।
- এড. উথোয়াই মং মারমা, রাঙ্গামাটি জজ কোর্ট।
- ডাঃ পরশ খীসা, সেক্রেটারী, টংগ্যা।
- মঙ্গল কুমার চাকমা, সমাজকর্মী।
- মনিরুল আলম, প্রতিনিধি, দি ডেইলি ষ্টার।
- এড. জুয়েল দেওয়ান, কোর্ডিনেটর, বাষ্ট, রাঙ্গামাটি ইউনিট।
- এড. দুলাল কান্তি সরকার, সাবেক সভাপতি, রাঙ্গামাটি জেলা বার এসোসিয়েশন।
- মোহাম্মদ আলী, প্রতিনিধি, দৈনিক জনকণ্ঠ।
- দেবাশীষ, প্রতিনিধি, BTN.
- ডাঃ শৈলু চাক, মোনঘর, রাঙ্গামাটি।
- সুচন্দা প্রভা তঞ্চঙ্গ্যা, সহকারী শিক্ষিকা, লেকার্স পাবলিক স্কুল, রাঙ্গামাটি।
- কংজা প্রু চৌধুরী, হেডম্যান, ৯৫(এ) বেতবুনিয়া, কাউখালী, রাঙ্গামাটি।
- মনীষা তালুকদার, গ্রীনহিল।
- পরিমল চন্দ্র তালুকদার, হেডম্যান, ১৪২নং ডুবা জারুল, জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি।
- তৃষ্ণা ত্রিপুরা, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট, রাঙ্গামাটি।
- যতীন্দ্র প্রসাদ তঞ্চঙ্গ্যা, যুগ্ম সচিব (অবঃ)।
- জবা তঞ্চঙ্গ্যা, প্রধান শিক্ষিকা, ডলুছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
- শৈ অং প্রু, C.D.C, SMEC.
- সুরেশ চাকমা, ইউপি চেয়ারম্যান।
- দীপিকা দেওয়ান, হেডম্যান, ১০৯নং সাপছড়ি মৌজা, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি।
- সুখেশ্বর চাকমা (পল্টু), UNDP.
- বিথি তঞ্চঙ্গ্যা, সহকারী শিক্ষিকা, রাঙ্গামাটি সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।
- উচিং থোয়াই, হেডম্যান, ২৯৯নং ছোট বমু, লামা, বান্দরবান।
- থুই ম্রানু মারমা, সাবেক সভানেত্রী।
- মংএওউ মারমা, UNDP.
- রত্না তঞ্চঙ্গ্যা, সমাজকর্মী।

Scanned with OKEN Scanner

পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন সংরক্ষণ ও সচেতনতা উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ে পিপিআইআর প্রকল্পের আওতায় বান্দরবানে আয়োজিত সেমিনারে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ

◆ স্থান: রেষ্টুরেন্ট রী স্বং স্বং, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

◆ তারিখ: ০৮/০২/২০০৬ইং, বুধবার।

- কে.এস.মং, সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ।
- ক্য শৈ অং, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও হেডম্যান, ৩৩৯নং বেক্ষ্যং মৌজা, রোয়াংছড়ি, বান্দরবান।
- থোয়াইংচ প্রু মাষ্টার, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান।
- বাছা খেয়াং, প্রাক্তন সদস্য, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান।
- তাতু লুসাই, প্রধান শিক্ষক, হাফেজঘোনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
- রাংলাই ম্রো, নির্বাহী পরিচালক, ম্রোচেট।
- খুশিরায় ত্রিপুরা, আইনজীবি।
- মোঃ বাদশা মিয়া, সভাপতি, বান্দরবান প্রেস ক্লাব।
- সিং ইয়ং ম্রো, পরামর্শক।
- থোয়াইসা প্রু, কর্মসূচী ব্যবস্থাপক, গ্রীনহিল।
- মংকিউজাই চাক, উন্নয়নকর্মী।
- উছোমং মারমা, সমাজকর্মী।
- চথুই প্রু, সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট, বান্দরবান।
- সত্যহা পাঞ্জি ত্রিপুরা, সমাজসেবক (শিক্ষক)।
- উইলিয়াম ত্রিপুরা, সভাপতি, বাংলাদেশ, ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদ, বান্দরবান শাখা।
- সিঅং খুমি, সমাজকর্মী ও পরামর্শক।
- ডনাইপ্রু নেলী, নির্বাহী পরিচালক, অনন্যা কল্যাণ সংস্থা, বান্দরবান।
- থোয়াইসা মারমা, সমাজকর্মী, তহজিংডং।
- বাঁসিং অং, সমাজসেবী।
- মংথোয়াইচিং হেডম্যান, ৩১৪নং সুয়ালক মৌজা, বান্দরবান সদর, বান্দরবান।
- মংএক্য মারমা, সমাজকর্মী।
- চিং হ্লা মং চাক, সমাজকর্মী।
- ওয়াইচিং প্রু মারমা, সাধারণ সম্পাদিকা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি, বান্দরবান শাখা।

Scanned with OKEN Scanner

- মং প্রু মারমা, সিএন্ডটিও।
- জলিমং মারমা, সমাজকর্মী।
- জুয়ামলিয়ান আমলাই, বম সোশ্যাল কাউন্সিল।
- সুমিতা চাকমা, আইনজীবি।
- নুমেপ্রু, সভানেত্রী, পার্বত্য মহিলা সমিতি, বান্দরবান।
- মিনারুল হক, সংবাদকর্মী।
- এ.কে.এম. জাহাঙ্গীর, প্রতিনিধি, দৈনিক পূর্বকোণ।
- অধ্যাপক মোঃ ওসমান গণি, সম্পাদক, দৈনিক সচিত্র মৈত্রী।
- মোহাঃ মুসা ফারুকী, প্রতিনিধি, মুক্তকণ্ঠ।
- মিলন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, সমাজসেবক।
- আলাউদ্দিন শাহরিয়ার, প্রতিনিধি, আমাদের সময়।
- কবির হোসেন সিদ্দিকী, প্রতিনিধি, চ্যানেল আই।
- বদরুল ইসলাম মাসুদ, জেলা প্রতিনিধি, দৈনিক সমকাল।
- মংসা থোয়াই চাক, হেডম্যান, ২৭০নং নাইক্ষ্যংছড়ি মৌজা, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান।
- মনিরুল ইসলাম মঞ্জু, প্রতিনিধি, যায় যায় দিন।
- এনামুল হক কাশেমী, প্রতিনিধি, আজাদী।
- আমিনুল ইসলাম বাচ্চু, সংবাদকর্মী।

১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন বিষয়ে বান্দরবানে আয়োজিত সেমিনার

Scanned with OKEN Scanner

পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন সংরক্ষণ ও সচেতনতা উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ে পিপিআইআর প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়িতে আয়োজিত সেমিনারে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ

♦ **স্থান:** শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তন, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

♦ **তারিখ:** ০১/০১/২০০৬ইং, বুধবার।

- পাই হ্লা প্রু চৌধুরী, মং সার্কেল চীফ, খাগড়াছড়ি।
- সুধাসিন্ধু খীসা, সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ।
- রক্তোৎপল ত্রিপুরা, সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ।
- কালাচাঁদ সিংহ, সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিসি অফিস, খাগাড়াছড়ি।
- প্রভাকর চাকমা, সভাপতি, জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি।
- নবীন কুমার ত্রিপুরা, অবঃ প্রধান শিক্ষক।
- হংসধ্বজ চাকমা, আহবায়ক, যোগাযোগ কমিটি।
- খগেশ্বর ত্রিপুরা, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদ, কেন্দ্রীয় কমিটি।
- প্রশান্ত কুমার ত্রিপুরা, সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদ, কেন্দ্রীয় কমিটি।
- বিবর্তন চাকমা, প্রতিনিধি, আলো।
- মিনু চাকমা, সভানেত্রী, মংগারাম পাড়া।
- অংসাউ মারমা, কোর্ডিনেটর, আর.এল.টি।
- ক্ষেত্র মোহন রোয়াজা, হেডম্যান, ২৫৭নং নুনছড়ি মৌজা, খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি।
- প্রীতি বিন্দু দেওয়ান, চেয়ারম্যান, ১নং খাগড়াছড়ি ইউপি।
- অংক্যচিং চৌধুরী, হেডম্যান, ২৬২নং গোলাবাড়ি মৌজা, খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি।
- চন্দ্র কিরন ত্রিপুরা, কার্বারী।
- শাপলা ত্রিপুরা, সহ-সম্পাদিকা, K.M.K.S.
- রনি বড়ুয়া, FDO, গ্রীনহিল।
- রুবি চাকমা, কাবিদাং।
- নুরুল আজম, সংবাদকর্মী।
- বীর কিশোর চাকমা, সমাজসেবক।

Scanned with OKEN Scanner

- চাইথোঅং মারমা, সমাজসেবক।
- সুই হ্লা প্রু চৌধুরী, হেডম্যান, ২৪২নং পুজগাং মৌজা, পানছড়ি ও সম্পাদক, জেলা হেডম্যান এসোসিয়েশন, খাগড়াছড়ি।
- আবু তাহের মুহাম্মদ, জেলা প্রতিনিধি, দৈনিক আমার দেশ ও এনটিভি।
- আদিব-উল হক, প্রতিনিধি, প্রথম আলো।
- জীতেন বড়ুয়া, প্রতিনিধি, দৈনিক জনকণ্ঠ।
- মুহাম্মদ আবু দাউদ, প্রতিনিধি, এটিএন বাংলা ও নয়াদিগন্ত।
- এডভোকেট অংসুইথুই মারমা, আইনজীবি।
- প্রতিমা রোয়াজা, মহিলা সম্পাদিকা, বাত্রিকস ও সা সম্পাদিকা, YWCA.
- নৃপেন চাকমা, জেলা কর্মসূচী ব্যবস্থাপক, গ্রীনহিল, খাগড়াছড়ি।
- মংসাথোয়াই, অবঃ প্রধান শিক্ষক ও কার্বারী, ২৫১নং চেংড়াছড়ি মৌজা।
- পুলক চাকমা, এমএলএসএস, গ্রীনহিল, খাগড়াছড়ি।
- ওমর ফারুক শামীম, জেলা প্রতিনিধি, ভোরের কাগজ।

১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন বিষয়ে
খাগড়াছড়িতে আয়োজিত সেমিনার

Scanned with OKEN Scanner

পিপিআইআর প্রকল্প কার্যক্রমে জনগোষ্ঠীভিত্তিক রীতিনীতি, প্রথা সম্পর্কীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং অধিকতর সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন এর লক্ষ্যে মাঠ বৈঠক ও কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ

♦ **স্থানঃ** রেইছা সাতকমল পাড়া, বান্দরবান
♦ **তারিখঃ** ০৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫

- মিলন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
- রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা
- আনন্দ কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
- দিব্যেন্দু তঞ্চঙ্গ্যা
- সুচিত্রা তঞ্চঙ্গ্যা
- শশী কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
- নলিনী মোহন তঞ্চঙ্গ্যা
- নিরকান্তি তঞ্চঙ্গ্যা

♦ **স্থানঃ** হোটেল দি রুফ, রাঙ্গামাটি
♦ **তারিখঃ** ১৮ ফেব্রুয়ারী হতে ২০ ফেব্রুয়ারী ২০০৭

- আনন্দ মোহন তঞ্চঙ্গ্যা
- রবিদয় তঞ্চঙ্গ্যা
- মিলন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
- বক্ষলি তঞ্চঙ্গ্যা
- তেজেন্দ্র লাল কার্বারী
- প্রিয়রঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা
- চন্দ্রজয় তঞ্চঙ্গ্যা
- মিলন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা
- আত্রমোহন কার্বারী
- ভূষন চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা
- বিশুলক্ষ
- নীলকান্তি তঞ্চঙ্গ্যা
- উমেং চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা
- ধর্মধন তঞ্চঙ্গ্যা
- গোপেন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা
- সুরেশ কার্বারী
- প্রতিজয় কার্বারী
- সুনীল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা
- যতীন চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা

Scanned with OKEN Scanner

তিন পার্বত্য জেলার আদিবাসী সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, প্রথাভিত্তিক ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইনে নারী ও শিশু অধিকার সুরক্ষার বিষয়ে পিপিআইআর প্রকল্প আয়োজিত গোল টেবিল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট নারীনেত্রীবৃন্দ

♦ স্থানঃ হোটেল দি রুফ, রাঙ্গামাটি।
♦ তারিখঃ ২৯ জুলাই, ২০০৫ইং।

- মাধবীলতা চাকমা
- আরতী চাকমা
- মঞ্জুলিকা চাকমা
- অঞ্জুলিকা খীসা
- নিরূপা দেওয়ান
- টুকু তালুকদার
- জুমবি চাকমা
- তন্দ্রা চাকমা
- সাগরিকা রোয়াজা
- শিউলি চাঁপা চাকমা
- সুনীতি দেওয়ান
- ত্রিবেনী খীসা
- মহতী চাকমা
- আর.এল. ব্যাকি লুসাই
- ফুলমতি ত্রিপুরা
- ক্রাজাই চৌধুরী
- মাসিং নেওয়ার (নিপু)
- সিয়াম পুই বম
- থুইম্রানু
- লিপিকা তঞ্চঙ্গ্যা
- জীবনশ্রী ত্রিপুরা
- কুলিতি ত্রিপুরা
- মনীষা তালুকদার
- স্বরস্বতী ত্রিপুরা
- শুভ্রা বড়ুয়া
- পচেমা মারমা
- ক্রাচিউ মারমা
- তৃষ্ণা ত্রিপুরা
- বীথি তঞ্চঙ্গ্যা
- সুচন্দা প্রভা তঞ্চঙ্গ্যা
- রত্না তঞ্চঙ্গ্যা
- হিমা চাকমা
- উল্কা ত্রিপুরা
- জবা তঞ্চঙ্গ্যা
- শুভ্রা চাকমা

আদিবাসী নারী নেত্রীদের সাথে গোল টেবিল আলোচনা